ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ (১৯৪৬-১৯৭১)

চাঁদ সুলতানা কাওছার*

Abstract: Dhaka Medical College Hospital started its Journey in a part of East Bengal and Assam Province Secretariat building built in 1904. The hospital was established on July 16, 1946 through a government order. Initially the hospital was not equipped with all the medical facilities and modern equipment. Within about one and a half year, all the internal departments of the hospital started functioning. However, it was not until the late forties and mid-fifties that the hospital started all kinds of initiatives related to the medical system. Modern treatment started in this hospital in the fifties but not all the complex diseases were treated. Similarly, various departments were under the process of modernization. Through this article, the history of the establishment of western medical system in East Bengal and Present Bangladesh will be known. Basically, the doctors of this hospital and the students who passed from Dhaka Medical College Started providing the first advanced Western medical services. Primary sources have been relied upon in writing the essay. Because no researcher has previously studied on this topic. In this case, data has been collected from the documents preserved from Bangladesh National Archives, especially *'A' Proceedings, 'B' Proceedings*, *Government Reports and Minutes*, *Assembly Proceedings, Gazetteers, Gazettes* and old Newspapers.

ভূমিকা

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের সাথে সংযুক্ত করে এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্ত হলো সংযুক্ত হাসপাতাল থাকা। হাসপাতাল ছাড়া মেডিকেল কলেজের পরিপূর্ণতা পায় না, কেননা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল বা ব্যবহারিক শিক্ষা হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, ওয়ার্ডে দেওয়া হয়। ফলে এই হাসপাতাল একাধারে চিকিৎসা শিক্ষা ও সেবার কাজে যুক্ত। হাসপাতালের শ্রেণিবিন্যাস অনুসারে এটি Class-1 State Public Hospitals and Dispensaries - যা তৎকালীন প্রাদেশিক তহবিল এবং রাষ্ট্র ও সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। (*List of Hospitals and Dispensaries in East Pakistan* 1963, pp. 1-4.) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ধনি থেকে শুরু করে দরিদ্র জনসাধারণ তথা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। উপরন্তু এই হাসপাতালের মাধ্যমে সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের উঁচু স্তরের চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী চিকিৎসকগণ দ্বারা উঁচু পর্যায়ের চিকিৎসা সেবা ও শিক্ষা দেওয়া হয়। তাই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে প্রবন্ধের আলোচ্য সময় পর্যন্ত এর ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যবস্থা, সেবা ও শিক্ষার যে উন্নয়ন ঘটেছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।

* সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণার লক্ষ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়ের ওপর গবেষণার মূল্য লক্ষ্য হলো প্রতিষ্ঠানটির সার্বিক ইতিহাস তুলে ধরা। পূর্ববাংলার প্রথম প্রতিষ্ঠিত উঁচু স্তরের অন্যতম প্রধান চিকিৎসাশিক্ষা ও সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উন্নয়ন ও বিকাশ কীভাবে হয়েছিল? প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে এই হাসপাতাল স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল কি? পূর্ববাংলার জনসাধারণের চাহিদা মেটাতে সক্ষম ছিল কি? সময়ের চাহিদার সাথে সাথে এবং ধীরে ধীরে হাসপাতালের কীভাবে আধুনিকীকরণ ও যুগোপযোগী করে তোলা হয়? সব ধরনের জটিল রোগের চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল কি? চিকিৎসা সেবার মান বিশ্ব-মানসম্মত ছিল কি, হাসপাতালের চিকিৎসকগণ উঁচু স্তরের যোগ্য ও দক্ষ ছিল কি? হাসপাতাল পরিচালনায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেমন ছিল, এর সীমাবদ্ধতা ছিল কি? ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ক্লিনিক্যাল শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা গবেষণার মূল লক্ষ্য।

সাহিত্য পর্যালোচনা

এই বিষয়ের ওপর পূর্বে কোনো গবেষণা হয়নি বললেই চলে। দক্ষিণ এশিয়া ও ব্রিটিশ ইতিহাসবিদগণ গত দুই দশক ধরে ঔপনিবেশিক ও ঔপনিবেশিকোত্তর ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেছেন। ভারতের চিত্তব্রত পালিত, শ্রীলতা চ্যাটার্জী, পার্থ দত্ত, প্রজিত কুমার মুখার্জী, অপরাজিতা ধর, ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ ডেভিড আরনল্ড, মার্ক হ্যারিসন, প্রমুখ ভারতের চিকিৎসা ব্যবস্থার ওপর গবেষণা করেছেন। চিত্তব্রত পালিত ও অপরাজিতা ধর (২০১৯) সম্পাদিত *Medical Hisotry of India: Diseipline, Disease, Death* গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে চিকিৎসার ইতিহাসের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। শ্রীলতা চ্যাটার্জী (২০১৭) এর *Western Medicine and Colonial Society: Hospital of Calcutta 1757-1800* গ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সাথে এর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রকৃতি ও সম্পর্ক দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ডেভিড আরনল্ড (২০০০)-এর *The New Cambridge History of Idnia: Science, Technology and Medicine in Colonial India* গ্রন্থে ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভারতের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসার ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। Mel Gorman, *'Indtroduction of Western Science into Colonial India: Role of the Calcutta Medical College'* প্রবন্ধে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসার উৎপত্তি বিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। অথচ পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান বা বর্তমান বাংলাদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান নিয়ে তেমন কোনো ইতিহাস চর্চা হয়নি। তবে বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ শরীফ উদ্দিন আহমেদ (২০০৭) *মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল স্কুল: ইতিহাস ও ঐতিহ্য ১৮৫৮-১৯৪৭* নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই প্রথম পূর্ববাংলায় এই চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশ নিয়ে গবেষণা করেন। এই গবেষণার মধ্য দিয়ে এই অঞ্চলের জনসাধারণের রোগ, চিকিৎসা চিকিৎসা ব্যবস্থা ও চিকিৎসা শিক্ষা প্রদানে এই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়। অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং এই মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা উল্লেখযোগ্য কয়েকজন শিক্ষার্থীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে কিছু গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে। এই গ্রন্থগুলোর বেশিরভাগই আত্মজীবনীমূলক ও স্মৃতিচারণমূলক। গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে আহমদ রফিক (২০০৩)-এর *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৪৭-১৯৭১*। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ইতিহাস জানার জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ডা. মনিলাল আইচ লিটু এবং এম আর মাহবুব-এর *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য* নামে গ্রন্থটি অনেকাংশে মৌখিক উৎস নির্ভর। মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলি সীমিত ও আংশিকভাবে তুলে ধরেছেন। তাই আলোচনার

ধারাবাহিকতায় সীমিত পরিসরে হাসপাতাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তসলিমা কবির ও এম এম আর মাহবুব সম্পাদিত (২০১৩) *শল্য চিকিৎসক ও ভাষা সৈনিক অধ্যাপক কবির উদ্দিন আহমদ*, অধ্যাপক আফজালুন্নেসা এবং এম আর মাহবুব সম্পাদিত (২০১৩) *প্রথম শহীদ মিনারের স্থপতি ডা. বদরুল আলম স্মারক গ্রন্থ* এবং সারওয়ার আলী (২০১০)-এর *পেরিয়ে এলাম অন্তবিহীন পথ*। এই গ্রন্থগুলো আত্মজীবনীমূলক ও স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ। গ্রন্থগুলো থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সর্ম্পকে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তাই এই বিষয়ের ওপর গবেষণা হয়নি বলেই গবেষণা করার প্রয়াস।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধের ওপর গবেষণা একটি প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চা, যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য দিক তথা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা, কাজ, বিকাশ ও উন্নয়ন এবং লক্ষ্য অর্জনের কার্যকর উপায় ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। প্রতিষ্ঠানের সফলতা ও ব্যর্থতার বিবরণের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, আর তা যদি হয় একটি দেশের প্রথম শ্রেণির অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল তাহলে তা গবেষণার বিশেষ দাবি রাখে। এই ধরনের হাসপাতালের দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দায়িত্ব গ্রহণ করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল তেমনি একটি চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পেছনে তৎকালীন ঔপনিবেশিক ভারতের ব্রিটিশ সামাজ্যের তথা পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আধিপত্যের ফসল। এখানে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের উঁচু স্তরের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

আলোচ্য প্রবন্ধের গবেষণা পদ্ধতি বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক, কারণ কোনো ঘটনার বিবরণ ছাড়া বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে শুরু থেকে গবেষণার সময় পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে প্রতিষ্ঠানটি এই অঞ্চলের জনস্বাস্থ্য চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে বিরাট ভূমিকা রেখেছে তা ফুটে উঠেছে। এই বিষয়ের ওপর গবেষণা করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক উৎসের ওপর নির্ভর করা হয়েছে। ইতঃপূর্বে এই বিষয়ে গবেষণা না হওয়ায় দ্বৈতীয়িক উৎসের ব্যবহার তুলনামূলক কম। আলোচ্য প্রবন্ধের গবেষণা মূলত প্রাথমিক উৎস নির্ভর। বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস (NAB), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রেয়ার সেকশন (DUL), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেকর্ড রুম (DURR), বাংলাদেশ ফামার্স এন্ড পাবলিকেশন অফিস (BFPO), ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরি (DMCL) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস ছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রভৃতিকে উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যেসব তথ্য অনুমান নির্ভর, বর্ণনার অপর্যাপ্ততা ও অপ্রতুল বিদ্যমান সেসব তথ্য তা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা হয়েছে এবং উৎসসমূহের প্রাপ্তিস্থানও উল্লেখ করা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও বিকাশ

১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রথম প্রিন্সিপাল কাম সুপারিনটেনডেন্ট ডব্লিউ জে ভারজিন-এর তত্ত্বাবধানে একটি স্টেট পাবলিক হাসপাতাল হিসেবে ৫০০ শয্যাবিশিষ্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভবনটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-১৯৪৫) আমেরিকান সৈন্যরা দখল করে নেয় এবং তাদের সামরিক হাসপাতাল গড়ে তোলে। যুদ্ধ শেষে তারা চলে গেলে ভবনের এই অংশে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট সহায়ক হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়, যা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হিসাবে পরিচিত। মূলত ১৯৪৬ সালের ১৬ জুলাই এক সরকারি আদেশ এর মাধ্যমে এই হাসপাতালটিকে ভিত্তি করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। প্রথম দিন এই হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ছিল ৮৩ জন। (বিগ্রেডিয়ার জহির উদ্দিন আহমেদ 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-৯৩' *৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুনমিলনী-৯৩*, ১৯৯৩।) ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ সজ্জিত হাসপাতাল নির্মাণের জন্য এই ভবনকে বেছে নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের ১৬ আগস্টের সময় ৭৫ শয্যা বিশিষ্ট একটি মেডিকেল ওয়ার্ড ও একটি সার্জিক্যাল ওয়ার্ড নিয়ে হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু হয়। (Dr. A.K. M Abdul Wahed, Principal-Cum-Superintentdent (ed), *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 15 August 1947 to 31st March 1948*, p. 5.) ছোট একটি কক্ষে কেবল একটি মাইক্রোস্কোপ নিয়ে কঙ্কালসার প্যাথলজি বিভাগ চালু হয়। দেশ বিভাগের পর মল, মুত্র পরীক্ষা এবং বহির্বিভাগের রোগী ও অভ্যন্তরীণ রোগীদের ভর্তি করার জন্য জরুরি কক্ষ চালু হয়।

মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের চিকিৎসাশিক্ষার ক্ষেত্রে হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল শিক্ষা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ওপর দক্ষ, যোগ্য চিকিৎসক হওয়া নির্ভর করে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে কোনো ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থী ছিল না। ফলে মেডিসিন ও ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের ওপর কোনো শিক্ষাদান করা হতো না। এর প্রধান কারণ সদ্য প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষে প্রি-ক্লিনিক্যাল বিষয়ের ওপর পাঠদান করা হতো। এ সময় হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগ ৭৫ শয্যাবিশিষ্ট ৩টি পুরুষ ওয়ার্ড এবং ১৫ শয্যাবিশিষ্ট একটি মহিলা ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ছিল। তখন ওয়ার্ডে কোনো অতিরিক্ত ফিজিশিয়ান ছিল না। চিকিৎসা সংক্রান্ত রেডিওলজিক্যাল কাজ মিটফোর্ড হাসপাতালে সম্পাদিত হতো। প্যাথলজির অধ্যাপকের মাধ্যমে রক্ত, থুথু, মুত্র, সেরোলজিক্যাল ও বায়োলজিক্যাল পরীক্ষার মাধ্যমে ক্লিনিক্যাল কাজ সম্পাদন করা হতো।

এ সময় মেডিকেল ইউনিটে মোট শয্যা সংখ্যা ছিল ৯০টি। অতিরিক্ত কোনো শয্যা ছিল না। মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৪৪৪ জন, মোট রোগ থেকে উপশমকারী রোগীর সংখ্যা ৩০০ জন, মোট রোগী লাঘব হওয়ার সংখ্যা ৩০০ জন যা শতকরা ৬৭.৫%, হাসপাতাল থেকে মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৫০ জন যা শতকরা ১১.৩% এবং মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১০ জন যা শতকরা ২.২% ছিল। (Dr. A.K. M Abdul Wahed, Principal-Cum-Superintentdent (ed) *1948*, p. 5) অন্যদিকে হাসপাতালের সার্জিক্যাল ইউনিটে মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ১৫১ জন। যার মধ্যে ১৩২ জন আরোগ্য লাভ করে এবং ১৯ জনের মৃত্যু হয় । এ সময় মেডিকেল কলেজের ছাত্রদেরকে ৪ দিনের জন্য ওয়ার্ড ক্লিনিক দেওয়া হতো। তারা সপ্তাহে দুই দিন অপারেশন থিয়েটারে উপস্থিত থাকত। একদিন রাতের বেলায় ইমার্জেন্সি ডিউটি পালন করতে হতো এবং একদিন দিনের বেলায় ইমাজেন্সি অফিসারদের সহায়তা করতে হতো। এ সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন মেজর এফ ডব্লিউ এলিনসন (এফআরসিএস, আইএমএস (অবসর), রেসিডেন্ট সার্জন ডাক্তার জি কিবরিয়া (এমবি) এবং হাউজ সার্জন ডাক্তার এ এইচ হায়দারী (এমবি)। আবার হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল সার্জারি বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ২৪৫ জন। এর মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হয়। ছোট-বড় মোট ২২৭টি (বড় ৭৮ ও ছোট ১৪৯) অস্ত্রোপচার করা হয়। অস্ত্রোপচারে মোট মৃত্যুর হার ২%। এই বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন ডাক্তার জি আহমেদ এমবি (কলকাতা), হাউজ সার্জন ডাক্তার এ মজিদ (এমবি)। (Dr. A.K. M Abdul Wahed, Principal-Cum-Superintentdent (ed) *1948*, pp. 19-25) দেশ বিভাগের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মেডিসিন, সার্জারি মিডওয়াইফারিতে ক্লিনিক্যাল শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি হয়ে পড়ে। দেশ বিভাগের পূর্বে ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থী না থাকলেও দেশভাগের পরে ক্লিনিক্যাল শিক্ষার্থী পাওয়া যায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দেশ বিভাগের কারণে কলকাতা মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের পূর্ববাংলার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী ঢাকা মেডিকেল কলেজে চলে আসে। এসব মাইগ্রেশন করা শিক্ষার্থী ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লিনিক্যাল শিক্ষা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে দেশ

বিভাগের প্রায় এক বছর পর তিনটি মেডিকেল ওয়ার্ড, তিনটি সার্জিক্যাল ওয়ার্ড এবং বহির্রোগী বিভাগ হিসাবে ব্যবহৃত একটি জরুরি কক্ষ নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল গঠিত হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে সবধরনের বহির্রোগীদের বিভাগের (মেডিসিন, সার্জারি, স্ত্রীরোগ ও প্রসুতিবিদ্যা, চক্ষু ও নাক, কান, গলা বিভাগ) জন্য ৯টি ছাউনি নির্মাণ করা হয়। দেশ বিভাগের পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫টি বিভাগ তথা, মেডিসিন, সার্জারি, মিডওয়াফারি অফথালমোলজি (চক্ষু), রেডিওলজি বিভাগ নিয়ে যাত্রা শুরু করে। (Dr. A.K. M Abdul Wahed, Principal-Cum-Superintentdent (ed) *1948*, p. 7) এ সময় বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ, এক্স-রে বিভাগ, ইসিজি, বিএমআর, ইলেকট্রোথেরাপেটিক বিভাগ এবং রক্ত সঞ্চালন বিভাগ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিদ্যমান ছিল না। মিটফোর্ড হাসপাতালে এক্স-রের কাজ করা হতো। (Dr. A.K. M Abdul Wahed, Principal-Cum-Superintentdent (ed) *1948*, p. 26) এক-দেড় বছরের মধ্যে একটি সাধারণ হাসপাতাল হিসাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ সব বিভাগ কাজ করতে শুরু করে। (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946-52*, East Bengal Government Press 1954, p, XVI.) ফলে এই দেশের জনসাধারণ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছ থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পেতে শুরু করে। ব্যাপকভাবে হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং হাসপাতাল রোগীতে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে থাকে। দেশ বিভাগের সময় থেকে গবেষণার পর্যালোচিত সময় পর্যন্ত হাসপাতালে অতিরিক্ত রোগীর চাপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় থেকে আরো বিভিন্ন ধরনের বহির্রোগী বিভাগ খোলা হয় এবং এগুলো দিনদিন রোগীদের কাছে আরো বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করে, যা রোগীদের সংখ্যা দ্বারা বোঝা যায়। ১৯৪৭-৪৮ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীদের বিভিন্ন বিবরণ তথা মেডিকেল ইউনিট, সার্জিক্যাল ইউনিট (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital,* 1954, p, 26-27.) এবং হাসপাতালে বিশেষ সেবাপ্রাপ্ত রোগীদের সংখ্যা, হাসপাতালের মোট ব্যয়, (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital,* 1954) মেডিকেল স্টাফদের বেতনভাতা, ভ্রমণভাতা, পদের সংখ্যা, অন্যান্য জরুরি অবস্থা, মোট ব্যয় (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital,* 1954) ইত্যাদি থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৯৪৮ সালে ঢাকা শহরে কেবল দুইটি হাসপাতাল তথা মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এলোপ্যাথিক পদ্ধতির চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারিগুলোতে কোনো আয়ুর্বেদ ও হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal for the year 1948*, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 1.) এ সময় মিটফোর্ড হাসপাতালে অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগ থাকলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কেবলমাত্র অন্তর্বিভাগের ব্যবস্থা ছিল। বহির্বিভাগ তখনও চালু হয়নি। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 1.) এর অন্যতম কারণ সদ্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালটি মাত্র এক-দেড় বছর ধরে চালু হয়েছে। বহির্বিভাগ চালু করার বিষয়টি তখনও প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় ছিল। এ বছরের শেষের দিকে এই হাসপাতালে বহির্বিভাগ খোলা হয়। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal,* 1954, p. 1.)

ইতোমধ্যে ১৯৪৮ সালের ৭ সেপ্টেম্বর একজন মিডওয়াইফারির অধ্যাপক হিসাবে ডাক্তার এইচ আহমেদ এর দ্বারা ১০ শয্যা নিয়ে গাইনোকোলজিক্যাল বিভাগ খোলা হয়। একই বছরের ১৭ ডিসেম্বর মেডিকেল, সার্জারি এবং গাইনোকোলজির বহির্রোগী বিভাগকে আবাসিত করতে ৯টি ছাউনি নির্মাণ করা হয়। সরকারি নথিতে এ ব্যাপারে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৪৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর থেকে সার্জিক্যাল বিভাগ (পুরুষ), সার্জিক্যাল বিভাগ (মহিলা), মেডিকেল বিভাগ (পুরুষ), মেডিকেল বিভাগ (মহিলা), গাইনোকোলজি বিভাগ, নাক, কান, গলা বিভাগ বিভাগগুলো বহির্বিভাগে কাজ করতে শুরু করে। (*B.*

Proceedings, B. No. 104, List No. 109, Sl No. 78, *Public Health and Local Self-Government Department, 1949*, p. 1.) এ ছাড়া চক্ষু, দন্ত, চর্ম ও যৌন, কার্ডিওলজি ও বক্ষব্যাধি বিভাগ খোলার কথা উল্লেখ করা হয়। সরকারি নথিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, রবিবার এবং নববর্ষ, বড়দিন, মহাঅষ্টমী, ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আযহা, মহররম, নবীর জন্মদিন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছুটির দিন বহির্বিভাগ বন্ধ থাকবে বলে প্রিন্সিপাল টি আহমেদ সার্জন জেনারেলকে জানান। (*B. Proceedings*, B. No. 104, List No. 109, Sl No. 78, *1949*, p. 1.)

এ সময় হাসপাতালের কিছু কক্ষকে কেবিনে রূপান্তর করা হয়। এগুলো হাসপাতাল ভবনের নিচের এবং প্রথমতলায় অবস্থিত ছিল, এটা পুরাতন কেবিন হিসাবে পরিচিত। এসব কেবিনের দৈনিক চার্জ ছিল ৮ রুপি (প্রতিরোগী)। এ সময় মিটফোর্ড হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যা ছিল ৫২৯টি। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal for the year 1948*, 1954, p. 1.) এই শয্যাগুলোর অধিকাংশ সারা বছর রোগীদের দ্বারা পূর্ণ থাকত এবং কখনও কখনও শয্যা সংকটের কারণে জরুরি রোগীদের জন্য অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করতে হতো। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 1.) ১৯৪৮ সালে উল্লেখিত দুই হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ বিভাগ ও বহির্বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা ছিল ৮২,৬২৫ জন। এর মধ্যে উভয় হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ বিভাগে ১১,৮৯৫ জন এবং বহির্বিভাগে ৭০,৭৩০ জন। তবে বেশিরভাগ রোগীর চিকিৎসা হতো মিটফোর্ড হাসপাতালে। যেমন অন্তর্বিভাগে ৭,১০৯ জন এবং বহির্বিভাগে ৭০,৪৭২ জন। উভয় হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ বিভাগে মোট মৃত্যু ৬৩১ জন। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 2.) শুধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অন্তর্বিভাগে ৪৭৮৬ জন এবং বহির্বিভাগে ২৫৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 2.)

এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংক্রামক ব্যাধি ওয়ার্ড না থাকায় কলেরা, বসন্ত ও যক্ষ্মা রোগের রোগীদের চিকিৎসা করা হয়নি। মিটফোর্ড হাসপাতালে ১৫২ জন কলেরা রোগীর চিকিৎসা দেওয়া হয়, যার মধ্যে ৪ জনের মৃত্যু হয়। বিশেষ করে একমাত্র এই হাসপাতালেই বসন্ত ও যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। তবে ঢাকা শহরের চাহিদা অনুযায়ী এই ধরনের রোগীদের শয্যা সংখ্যা সীমিত ছিল। ৩২৮ জন যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসা করা হয়, যার মধ্যে মৃত্যু হয় ১১ জনের এবং ৩৭ জন বসন্ত রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং মৃত্যু হয় ৭ জনের। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 2.)

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৮ জন ডিপথেরিয়া রোগীর চিকিৎসা করা হয়। মিটফোর্ড হাসপাতালে কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই রোগের চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 2.) বস্তুত শুরুর দিকে এই হাসপাতালে সংক্রামক রোগের কোনো ওয়ার্ড ছিল না। এই হাসপাতালে চক্ষু রোগের চিকিৎসা করা হতো। রোগীর সংখ্যা মিটফোর্ড হাসপাতালের চেয়ে তুলনামূলক কম ছিল। মিটফোর্ড হাসপাতালে ১১,২৮৬ জন রোগী এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাত্র ৪৯ জন রোগী চিকিৎসা করা হয়, যার মধ্যে ৯ জন গ্লুকোমা, ১৫ জন চোখে ছানি পড়া এবং ২৫ জন চক্ষু রোগের অন্যান্য চিকিৎসা করা হয়। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 2.) এ সময় হাসপাতালে ২৯৩টি অস্ত্রোপচার করা হয়, যেখানে মিটফোর্ড হাসপাতালে ২০৪৭টি অস্ত্রোপচার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে সদ্য প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সবধরনের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও সব

বিষয়ের সার্জারি বিশেষজ্ঞ না থাকায় অস্ত্রোপচারের সংখ্যাও কম ছিল। ১৮৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মিটফোর্ড হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের সব ধরনের ব্যবস্থা ছিল। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 2.) বিশেষ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার যেমন, হাড়, লেন্স, পেট, প্রসূতি চিকিৎসা এবং অঙ্গচ্ছেদ করা হতো। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1954, p. 2.)

ইতোমধ্যে হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ বিভাগকে সম্প্রসারণ করা হয়। ৫টি মেডিকেল ওয়ার্ড, ৫টি সার্জিক্যাল ওয়ার্ড, একলামসিয়া ও সেপটিক রোগীদের জন্য ৪ শয্যাবিশিষ্ট একটি আলাদা কক্ষসহ একটি অবসট্রেটিক ও একটি গাইনোকলজিক্যাল ওয়ার্ড এবং ২০ থেকে ৩০টি নবজাতককে রাখার জন্য একটি নার্সারি স্থাপন করা হয়। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড ৩০ শয্যাবিশিষ্ট ছিল। তবে অপথালমোলোজিক্যাল ওয়ার্ড ৩৮ এবং ইএনটি ওয়ার্ড ১৬ শয্যা বিশিষ্ট ছিল। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য ৮ শয্যার একটি ওয়ার্ড এবং অসুস্থ নার্সদের জন্য ৫ শয্যার একটি ওয়ার্ড স্থাপন করা হয়। মেডিকেল ওয়ার্ডের একটি কার্ডিওলজির ওয়ার্ড হিসাবে ব্যবহৃত হতো, এটা ৮ শয্যাবিশিষ্ট ছিল এবং আরেকটি ওয়ার্ড ফার্মাকোলজির ডেমনসট্রেশনের জন্য ব্যবহৃত হতো। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed, *1948-49*, p. 31) এ সময় থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ক্রমবর্ধমানহারে উন্নয়ন ও বিকাশ হতে থাকে। আগস্ট ১৯৪৮—মার্চ ১৯৪৯ সালের মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগীদের বিবরণ ও খরচ থেকে তা বোঝা যায়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed, *1948-49*, p. 31)

একই বছরের বহির্বিভাগসহ ইএনটি এবং অপথালমোলজিক্যাল বিভাগ খোলা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed, *1948-49*, p. 31) ১৯৪৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ বিভাগে ৬৩২৭ জন এবং বহির্বিভাগে ৬৫,৫০৪ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal for the year 1949*, 1956, p. 1.) এ সময় ৪৮ জন কলেরা রোগীর চিকিৎসা করা হয়। অধিকাংশ বসন্ত ও যক্ষ্মা রোগী মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসা করা হতো যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৯ জন বসন্ত ও ৪১ জন যক্ষ্মা রোগী (অভ্যন্তরীণ বিভাগ) এবং বহির্বিভাগে ১০০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে ৫ জনের মৃত্যু হয়। ১৩ জন ডিপথেরিয়া, ১ জন কুষ্ঠ রোগী (অভ্যন্তরীণ বিভাগ) এবং বহির্বিভাগে ৬৯ জনের চিকিৎসা করা হয়। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1956, p. 2.) তবে এ সময় মিটফোর্ড হাসপাতালে কোনো কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা করা হয়নি। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1956, p. 2.) এ সময় চক্ষু বিভাগে ৭৩৭৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়. যার মধ্যে ১৩৪ জন ট্রাকোমা, ১২৫ জন গ্লুকোমা, ২৫৫৬ জন ছানি পড়া এবং ৪৫৬১ জন অন্যান্য চক্ষু রোগের চিকিৎসা করা হয়। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1956, p. 2.) এ বছর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২২৭০টি অস্ত্রোপচার করা হয়। অন্যদিকে মিটফোর্ড হাসপাতালে ১৬৯৬টি অস্ত্রোপচার করা হয়। (*Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal*, 1956, p. 2.) বস্তুত এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সবচেয়ে বেশি অস্ত্রোপচার করা হয়। একই বছরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কার্ডিওলজি বিভাগ খোলার জন্য একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়। এই বিভাগ খোলার জন্য এক বছরের আর্থিক খরচের একটি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়। (*B. Proceedings*, B. No. 107, List No. 109, Sl No. 81, 1949.) একই বছরের ১লা এপ্রিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্ডিওলজি বিভাগের কাজ শুরু করার জন্য হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট টি আহমেদকে একটি নির্দেশ দেওয়া হয়। এ সময় হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত ফিজিশিয়ান এ কে এম আহমেদ হাসপাতালের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবস্থা করার জন্য তাঁকে আহবান জানান

(*B. Proceedings*, B. No. 107, List No. 109, Sl No. 81, 1949.) এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট পূর্ববাংলার সার্জন জেনারেল এর কাছে তথ্যটি ১ জুন ১৯৪৯ তারিখে প্রেরণ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববাংলার সার্জন জেনারেল এর নোট থেকে জানা যায় যে,

> The Cardiology department has been opened in the Medical Hospital, Dacca, and the cardiologist has been allocated ten beds. (*B. Proceedings*, B. No. 107, List No. 109, Sl No. 81, 1949.)

অপরদিকে *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে,

> The cardiological department was opened on 8th June 1949. (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), *1949-50*, p, 61.)

একই বছরের ১১ জুলাই বহির্রোগী বিভাগের সাথে চর্ম ও যৌন বিভাগ যুক্ত করা হয়। ১৫ নভেম্বর বহির্বিভাগে দন্ত বিভাগ খোলা হয়। এ সময় ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারির অধ্যাপক হিসাবে ডাক্তার হুমায়রা সাঈদ (এমবি, এমআরসিওজি (লন্ডন)-কে দিয়ে ক্লিনিক্যাল মিডওয়াইফারি এবং গাইনোকোলজি বিভাগের যাত্রা শুরু হয়। এই বিভাগকে ১৫টি অবসটেট্রিক্যাল এবং ১৫টি গাইনোকোলজিক্যাল শয্যা বরাদ্দ করা হয়। কলেজের শিক্ষার্থীরা বছরের তিন মাসের জন্য এই ওয়ার্ডে কাজ করত। এ সময় এই বিভাগে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৬০ জন, মোট আরোগ্য লাভকারী রোগীর সংখ্যা ২৮৮ (৬২.৬%) জন, মোট রোগ থেকে মুক্ত ৮৬ (১৮.৭%) জন, মোট ঝুঁকি বন্ড থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ৪৬ (১০%) জন। মোট অন্যান্য অবস্থা থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগী ২৫ (৫.৫%) জন, মোট মৃত্যুর সংখ্যা ১৫ (মৃত্যুহার ৩.২%) জন এবং অস্ত্রোপচারে মৃত্যুহার ১.৯%। এ সময় হাসপাতালে মোট স্বাভাবিক প্রসবের সংখ্যা ১৪৬ জন, মোট যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রসব ৭ জন, মোট সিজারের সংখ্যা ৪টি, মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ১০৮টি (বড়-৪৮, ছোট ৬০)। (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), DMCH for the year *1949-50*, 1953-54, p, 89.) এ ছাড়া কিছু গুরুতর ও জটিল রোগের চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণ করা হয়। A case of accidental Haemorrhage two cases of ruptured ectopic pregnancy. (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), *1949-50*, p, 89.)

এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অতিরিক্ত সার্জনের ওয়ার্ডে টিউমার, মাংসপেশি এবং হাড়ের রোগ, যকৃত প্লীহা এবং অগ্নাশয় ইত্যাদি, এপেনডিসাইটিস, হাইড্রোসিল (hydrocele) সহ মুত্র, থাইরয়েড, হার্নিয়া, স্তন, পৌষ্টিকতন্ত্র, ফাইলেরিয়া, ফুসফুস, আঘাত জনিত সমস্যা, অপারেশন ছাড়া চিকিৎসা অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হয়। (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), DMCH for the year *1949-50*, 1953-54, p, 86.) এই ওয়ার্ডে মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৭০২ জন। মোট মৃত্যু ৬৯ জন। মোট অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ৫৩৭টি (বড় ১৮০, ছোট ৩৫৭), অস্ত্রোপচারে মৃত্যু ১০ জন, অস্ত্রোপচারে মৃত্যু হার ২%। (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), DMCH for the year *1949-50*, 1953-54, p, 86-87.) তাছাড়া এই ওয়ার্ডে কিছু রোগীর হাইপারনোফ্রামায় (hypernephroma) এবং থ্রোমকো এনজাইটিসের মতো জটিল রোগে মৃত্যু হয়। তবে চিকিৎসা করার চেষ্টা করা হয়। (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), *1949-50*, p, 86-87.)

এ সময় মেডিকেল ইউনিটের মেডিসিন বিভাগের বহির্রোগী বিভাগে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা করা হতো। যেমন- ম্যালেরিয়া, পেপটিক আলসার, ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, সিরোসিস, ফুসফুসের রোগ চর্মরোগ, দাদ, কৃমি, অন্ত্রের সংক্রমন বা এসকারাইসিস (ascariasis)। এটা লক্ষণীয় ছিল যে, ম্যালেরিয়ার পরে ছিল প্যাপটিক আলসার, আমাশয় এবং ডায়রিয়া। এই বিভাগে মোট নতুন এবং পুরোনো রোগীসহ ৫৩,২৩৪ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং বিভাগে মোট চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ১ জন। একজন

রেসিডেন্ট ফিজিশিয়ান ডাক্তার টি বাসুনিয়া, এমবি (কলকাতা) এবং হাউজ অফিসার ডাক্তার সৈয়দ মহিউদ্দিন আহমেদ এমবিবিএস (পাটনা) তারা রোগীদের চিকিৎসা দেওয়ার পাশাপাশি কলেজের শিক্ষার্থীদের সকাল ৮.৩০ থেকে ১১.০০টা পর্যন্ত ক্লিনিক দিতেন। অন্যদিকে গাইনোকোলজিক্যাল ইউনিটের বর্হিরোগী বিভাগেও বিভিন্ন ধরনের স্ত্রী ও প্রসূতিরোগের চিকিৎসা দেওয়া হতো। যেমন- প্রাইমারি স্টেরিলিটি (primary sterility), জরায়ু ক্ষয় (erosion urvix), গর্ভাবস্থার টক্সিমিয়া (toxaemia of pregnancy), প্রলাপস (prolapse), টিউমার এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের রোগ। এ সময় এই বিভাগে মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ১২৪০। এর মধ্যে নতুন ছিল ৭৭২ জন এবং পুরোনো ছিল ৪৬৮ জন। এই বিভাগে দুইজন স্টাফ ছিল। একজন হলেন রেসিডেন্ট সার্জন ডা. মঈনউদ্দিন আহমেদ, এমবি (কলকাতা) এবং হাউজ সার্জন ডা. জে বি কাজী, এমবিবিএস। (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), DMCH for the year *1949-50*, 1953-54, p, 90.) এ সময় হাসপাতালে ক্রমবর্ধমানহারে যে উন্নয়ন হচ্ছিল তা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগী, ভর্তিকৃত রোগী, বিভিন্ন রোগ, নতুন নতুন বিশেষ সেবা প্রদানের সূচনা, স্টাফ সংখ্যা ও হাসপাতালের মোট ব্যয় দেখে বোঝা যায় (Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), DMCH for the year *1949-50*, 1953-54, p, 92-94.) এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্টাফদের বিবরণও পাওয়া যায়। (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1949-50, p. 63.)* ১৯৫০ সালে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগে সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির ঘাটতি ছিল। যতগুলো ওয়ার্ড থাকা দরকার ততগুলো ওয়ার্ড নেই, যা সে সময়ের পূর্ববাংলা লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য ভোলানাথ বিশ্বাস উল্লেখ করেন। (*Assembly Proceedings* (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly*, Fourth Session, 1949-50, 1952, P. 52.) এ সময় হাসপাতালের প্রধান সমস্যা ছিল বহির্বিভাগে। এটি অস্থায়ী ভবনে ছিল। দেশ বিভাগের পর যখন এগুলো দ্রুত স্থাপন করা হয়, তখন আশা করা হয় যে, হাসপাতাল ভবনের পূর্ব অংশটি এক বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দিবে এবং এই ব্যাপারে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। কিন্তু দুভাগ্যবশত পূর্ব অংশ পাওয়ার প্রচেষ্টার কোনো অগ্রগতি হয়নি। কেননা এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ও অফিস ছিল এবং বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এটি খালি করতে অপরাগ ছিলেন। এই সমস্যা দূর করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বহির্বিভাগের জন্য একটি নতুন হাসপাতাল নির্মাণের প্রস্তাব করা হয় এবং তহবিল পাওয়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে ওয়ার্ড যুক্ত করা হয়। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ভবনে আংশিকভাবে একটি কলেজের অংশ হিসেবে এবং আংশিক শিক্ষার্থীদের আবাস হিসাবে ব্যবহার করা। তাই কলেজ ভবনের পশ্চিম দিকে একটি নতুন বহির্বিভাগ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয় এবং এটি বিবেচনার জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করা হয়। কলেজ ও হাসপাতালের আসন পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে বহির্বিভাগের সমস্যা সমাধানের ওপর জোর দেওয়া হয়। যাতে পরিদর্শনকারীদের বোঝানো যায় যে, একটি বহির্বিভাগ নির্মাণের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বহির্বিভাগের শিক্ষা ও পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা সরবরাহের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সে সময় (১৯৫০) বহির্বিভাগে মেডিকেল, সার্জিক্যাল, স্ত্রীরোগ, চক্ষু, ইএনটি এবং দন্ত তথা বেশিরভাগ বিভাগ প্রয়োজন ছিল। ইএনটি ও দন্ত বিভাগের জন্য কিছু সাজসরঞ্জামের ফরমাশ পেশ করা হয়। অন্যান্য যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনার ব্যবস্থা করা হয় এবং বহির্বিভাগকে সংগঠিত করার জন্য প্রস্তাব করা হয়। (*B. Proceedings*, B. No. 128, List No. 109, Sl No. 102*, Public Health and Local Self-Government Department,* 1953, p. 3.)

১৯৫০ সালের ২২ এপ্রিল এক্স-রে বিভাগ খোলা হলেও বিভাগটি অসম্পূর্ণ ছিল। এক্স-রে করা হতো না। ডায়াগনস্টিক সেট স্থাপন করা হলেও আমেরিকা থেকে আনার সময় এর প্রধান টিউব ভেঙে যায়। বিষয়টি ওয়াশিংটনে পাকিস্তান হাইকমিশনারে জানানো হয় এবং নতুন টিউব সংগ্রহের জন্য অনুরোধ করা হয়। এটা যাতে ভেঙে না যায় সেজন্য আকাশ পথে আনার ব্যবস্থা করা হয়। ডিপ-থেরাপির সেট

প্রস্তুত করা হয়। ডিপ-থেরাপির দেওয়াল নিরাপদ রাখার জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রকৌশলীর দ্বারা এই কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর এক্স-রে সেট চালু হবে বলে উল্লেখ করা হয়। একই বছরের অক্টোবর মাসে ইলেক্ট্রোথেরাপেটিক বিভাগ খোলা হয়। এ সময় একজন উপযুক্ত রেডিওলজিস্ট নেওয়া সম্ভব হয়নি। অপরদিকে অপারেশন থিয়েটারগুলো পুনর্গঠন করা প্রয়োজন দেখা দেয়। আরো অধিক স্টেরিলাইজেশন প্লান্ট এবং বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের ঘাটতি থাকায় সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা হয়। ইতোমধ্যে বিদেশ থেকে বিপুল পরিমাণে হাসপাতালের সাজসরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি আনা হয় এবং বিশেষ বিশেষ বিভাগের সামগ্রী তথা কার্ডিওলজি, দন্ত ইএনটি'র জন্য আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতি আনার জন্য ফরমাশ দেওয়া হয় কিন্তু সরবরাহ করা হয়নি। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের স্টাফদের পদের ব্যাপারে হাউজ সার্জন, হাউজ ফিজিশিয়ান, ডেমনস্ট্রেটর ইত্যাদির জন্য ৭৬টি পদ অনুমোদন করা হয়। পিএসসিকে নতুন প্রার্থী নিয়োগ এবং সরকারকে এটা দ্রুত সম্পন্ন করতে বলা হয়। ১৯৫০ সালের মে মাসে কলেজ পরিদর্শনের পূর্বে উল্লিখিত ঘাটতিগুলো চিহ্নিত করা হয় এবং এগুলো সমাধানের প্রস্তাব করা হয়।

এদিকে ১৯৫০ সালের ১০ এবং ১১ জুলাই পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ (অধ্যাপক এম এ এইচ সিদ্দিকী, অধ্যাপক এম এ পীরজাদা, অধ্যাপক এমএল মিস্ত্রী) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তাঁরা হাসপাতালের প্রধান ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেন। এই ত্রুটিগুলো পূরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন, (*B. Proceedings*, B. No. 128, List No. 109, Sl No. 102, 1953, p. 3.)

ক. বিশেষ বিশেষ বিভাগের জন্য আলাদা অপারেশন থিয়েটার।
খ. অধ্যাপকদের জন্য ক্লিনিক্যাল কক্ষ
গ. পর্যাপ্ত প্রসূতি কক্ষ
ঘ. যক্ষ্মা, মানসিক রোগ ও সংক্রমক রোগের জন্য শয্যা।
ঙ. সম্পূর্ণভাবে এক্স-রে বিভাগকে নির্মাণ করা।
চ. ইএনটির পরীক্ষা বুথ, গর্ভবর্তী ও যৌন রোগের জন্য বহির্বিভাগে পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করা।

উপরিউক্ত ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে ইএনটি বিভাগের জন্য একটি আলাদা অপ্যারেশন থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়। গাইনোকোলজিক্যাল অপারেশনের জন্য সাধারণ সার্জারির তিনটি অপারেশন থিয়েটার এবং লেবার রুম ছেড়ে দিয়ে নিচের তলায় প্রসূতি ওয়ার্ড স্থানান্তর করা হয়। এর ফলে প্রসূতিদের জন্য অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হয়। অধ্যাপকদের জন্য ক্লিনিক্যাল কক্ষগুলো নির্মাণাধীন ছিল। হাসপাতালের শয্যাগুলো পুনর্ব্যবস্থাপনা চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে বণ্টন করা হবে। যখন বড় এক্স-রে সেটটি ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয় তখন নির্মাণাধীন ডার্ক রুমের সাথে এই বিভাগটি স্থানান্তর করা হয়। ইতোমধ্যে এক্স-রে থেরাপি সেটটি মেরামত করার জন্য আমেরিকা থেকে প্রয়োজনীয় খুচরা যন্ত্রাংশ আনার ব্যবস্থা করা হয়। নতুন কলেজ ব্লকের নির্মাণ কাজ শেষ হলে কলেজের অংশ বহির্বিভাগের জন্য ব্যবহৃত হবে। এটাকে বহির্বিভাগে রূপান্তরের জন্য বড় ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা দ্বারা পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের নির্দেশিত ত্রুটিগুলো পূরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যেখানে বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, মানসিক পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ড, গর্ভবতী মহিলাদের ক্লিনিক এবং চর্ম ও যৌন রোগের বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির অংশটি অধিগ্রহণের জন্য আর্থিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এর ফলে হাসপাতালের আরো সম্প্রসারণ এবং হাসপাতাল ভবনের বাইরের কোনো একটি ভবনকে সংক্রামক ওয়ার্ডে রূপান্তর করা সম্ভব হয়।

ইতোমধ্যে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক নির্দেশিত অনেক ঘাটতি পূরণ করায় কাউন্সিল সন্তোষ প্রকাশ করে এবং বাকিগুলো পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। (*B. Proceedings*, B. No. 128, List No. 109, Sl No. 102, 1953, pp. 3-4.) ১৯৫১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে কলেজ ও হাসপাতালের ঘাটতি পূরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ববাংলার সার্জন জেনারেল কর্নেল এম কে আফ্রিদি, (পিএমএস) পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট লে. কর্নেল এম এ জাফরকে চূড়ান্তভাবে জানান। (*B. Proceedings*, B. No. 128, List No. 109, Sl No. 102, 1953, p. 5.) একদিকে কলেজ ও হাসপাতালের ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে, অন্যদিকে হাসপাতালের জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময়ের বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা, নতুন নতুন আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, জটিল রোগের চিকিৎসা সেবা প্রদান থেকে তা বোঝা যায়।

১৯৫০-৫১ সালে হাসপাতালের মেডিকেল ইউনিটের বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ৮৮,৯৬৯ জন। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 120.) ১৯৪৯-৫০ সালের মতো বিভিন্ন রোগ ছাড়াও ব্রঙ্কোজেনিক কাসিনোমা, লিভার ক্যানসার, পরিপাকতন্ত্রের ক্যানসার রোগের চিকিৎসা করা হয়। এ সমস্ত রোগীদের অন্তর্বিভাগের রোগীদের মতো ভর্তি ও চিকিৎসা করা হতো। অন্যদিকে সার্জিক্যাল ইউনিটের সার্জারি বিভাগে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জেনারেল সার্জারির ওপর ৪৫টি, বেড সাইট ক্লিনিক ১৩৮টি, আউটডোর ক্লিনিক ১৮টি এবং ক্লিনিক ১২টি দেওয়া হতো। এই বিভাগে মোট ১,০৭৬ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং মোট মৃত্যু ৭৯ জন। এ সময় হাসপাতালের সার্জিক্যাল ইউনিটের রেজিস্ট্রার ডাক্তার নওয়াব আলী এর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সংক্রান্ত অনুষ্ঠানগুলো রেডিও-তে প্রচার হতো। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 120.) পূর্ববাংলার জনসাধারণকে স্বাস্থ্য ও আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ে সচেতন করার জন্য এসব অনুষ্ঠান প্রচার হতো। হাসপাতালের এডিশনাল সার্জনের ওয়ার্ডগুলোতে ৮২১ জন রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এর মধ্যে মৃত্যু হয় ৫৮ জনের। মোট ৫২৭ টি (বড় ১৯২, ছোট ৩৩৫) অপারেশন করা হয় এবং অপারেশনে ১৮ জনের মৃত্যু হয়। ওয়ার্ডের এডিশনাল সার্জন ছিলেন জি আহমেদ। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 120.)

১৯৫০-৫১ সালে এডিশনাল ফিজিশিয়ানের ওয়ার্ডে চিকিৎসার পাশাপাশি কলেজের শিক্ষার্থীকে ক্লিনিক্যাল শিক্ষাদান করা হতো। এই ওয়ার্ডে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এবং সংক্ষিপ্ত এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষার্থীদের দুই মাসের জন্য ওয়ার্ডে কাজ করতে হতো। প্রতিদিন তাদের ওয়ার্ড ক্লিনিক দেওয়া হতো। নির্দেশনা অথবা বাস্তবিক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হতো। প্রত্যেক ছাত্রের জন্য মহিলা ওয়ার্ডের একজনসহ দুই-তিনজন রোগী বরাদ্দ করা হয়। রোগীদের এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যে, প্রত্যেক ছাত্রের জন্য একই ধরনের রোগী থাকা, যেমন, প্রতি ১০-১৫ দিন পর এই শয্যাগুলো পরিবর্তন করা হয়। ছাত্রদেরকে প্রতিদিন জটিল রোগের রোগী এবং বিকল্প দিনগুলোতে দুরারোগ্য রোগের রোগীদের অগ্রগতি রির্পোট লেখার নির্দেশনা দেওয়া হতো। প্রতিদিন হাউজ ফিজিশিয়ান এবং সপ্তাহে দুইদিন ভিজিটিং ফিজিশিয়ান দ্বারা হিস্টরি শিট যাচাই করা হতো। প্রতিদিন হাউজ ফিজিশিয়ান এবং মাঝে মাঝে ভিজিটিং ফিজিশিয়ান দ্বারা সান্ধ্যকালীন ক্লিনিক দেওয়া হতো। শিক্ষার্থীদের দুইটি ব্যাচ করে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হতো, যেমন-মল, মুত্র, রক্ত পর্যায়ক্রমে পরীক্ষা করা হতো এবং এই দুইটি ব্যাচকে ইমার্জেন্সির দায়িত্ব পালন করতে হতো। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির রির্পোটটি সিনিয়র হাউজ ফিজিশিয়ান দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। ওয়ার্ডটি শিক্ষার্থীদের ক্লিনিক্যাল শিক্ষাদানের পাশাপাশি রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করে। ফলে ওয়ার্ডটি ৩০ শয্যা নিয়ে একটি পুরুষ ওয়ার্ড এবং ১০ শয্যা নিয়ে একটি মহিলা ওয়ার্ড গঠন করা হয়। এ ছাড়া অতিরিক্ত ১৫ থেকে ২০টি শয্যা ছিল। এ সময় এই ওয়ার্ডে মোট ৫৫৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে মোট আরোগ্য লাভকারী রোগীর সংখ্যা ৪৮০ জন, হাসপাতাল থেকে মোট অব্যাহতিপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ২৪ জন,

অন্যান্য ছিল ৮ জন এবং মোট ৪১ জনের মৃত্যু হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 118.)

অন্যদিকে এ বছর হাসপাতালে মিডওয়াইফারি এবং গাইনোকোলজির বহির্বিভাগে অনেক রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই বিভাগে বিভিন্ন স্ত্রীরোগ তথা ক্রনিক সালপিজাইটিস (chronic sulpingitis), ইরোসন অব সার্ভিক্স (erosion of cervix) প্রলাপস অব ইউটেরাস (prolaps of uterus), রিটোভারটেড ইউরেটাস (retroverted uterus), লিউকোরিয়া (leucorrhoea), বন্ধ্যাত্ব (sterility), ভালভো ভ্যাজাইনাইটিস (vulvo-veginitis) ইত্যাদি রোগের চিকিৎসা দেওয়া হয়। এই বিভাগ থেকে বিভিন্ন ধরনের রোগী ভর্তি করা হয়। যেমন- ফ্রাইব্রয়েড ইউটেরাস (fibroid uterus) ওভারিয়ান সিস্ট (ovarian cyst), পেরিনিয়াল টিয়ার (perineal tear), টিও মাস (t.o. mass), অ্যাক্টোপিভ প্রেগনেন্সি (ectopic pregnancy) এবং অন্যান্য প্রেগনেন্সি রোগ, জরায়ু ক্যান্সার (cervix cancer) ফিলারাইসিস অব দ্য ভলভো (filarissis of the vulva) ইত্যাদি। এ সময় জরায়ুর ইলেকট্রকুটেরি এবং জরায়ু ক্যানসারের বায়োপসি করা হতো। এই বিভাগে মোট নতুন চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৪৫০৩ জন এবং পুরাতন ৩৪৭৬ জন। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 118.) বস্তুত ১৯৫০-৫১ সালে হাসপাতালের বিভিন্ন ইউনিটের বিভিন্ন বিভাগের অন্ত বিভাগ বহির্বিভাগ এবং অন্যান্য বিভাগে অসংখ্য রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর দ্বারা হাসপাতালের জনপ্রিয়তা, চাহিদা ও গ্রহণযোগ্যতাকে তুলে ধরে, যা হাসপাতালের রোগীর সংখ্যা বা উপস্থিতি থেকে বোঝা যায়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 118.)

রোগীদের বিবরণ, বিশেষ বিশেষ সেবার ধরন ও খরচ দেখে বোঝা যায় যে, এ সময় হাসপাতালের অন্ত ও বহির্বিভাগে সবধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 118.) পূর্বের চেয়ে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল এবং আগে যেখানে এক্স-রে, ইসিজি, বিএমআর অন্যান্য কাজ মিটফোর্ড হাসপাতালে সম্পন্ন হতো, এ সময় তা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1950-51*, p. 118.) ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল আধুনিক থেকে আরো আধুনিকতর এবং অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ১৯৫১ সালের এপ্রিলে ডা. ই ফরফোটাকে রেডিওলজিস্ট হিসাবে নিয়োগের মাধ্যমে এক্স-রে বিভাগের আরো পুনর্গঠন করা হয়। এ ছাড়া এই বিভাগের অন্যান্য স্টাফদের মধ্যে সহকারী রেডিওলজিস্ট হিসাবে ডা. মো. ইব্রাহীম, এমবি (কলকাতা), এমআরসিপি (লন্ডন), সহকারী সার্জন হিসাবে ডা. এ কে এম তাহেরুল ইসলাম এবং ১জন টেকনিশিয়ান ও ১ জন সহকারী টেকনিশিয়ান ছিল। বিভাগটিকে ফরফোটা একটা মানসম্মত অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন, তা বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে ফুটে ওঠে। এ সময় এক্স-রে বিভাগে ৫,৬৫২ জনের পরীক্ষা করা হয়। (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946-52*, 1954, p. 130.)

কলেজের শিক্ষার্থীদের বক্ষব্যাধি রোগের বিষয়ে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একই বছরের আগস্ট মাসে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বক্ষব্যাধি বিভাগ খোলা হয়। এর সাথে একটি বহির্বিভাগও চালু করা হয়। তবে রোগীদের জন্য কোনো অভ্যন্তরীণ ওয়ার্ড চালু করা হয়নি। ইতঃপূর্বে শিক্ষার্থীদের ক্লিনিক্যাল লেকচার ও ডেমনস্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের টিবি ওয়ার্ড ব্যবহৃত হতো। যাহোক এই বিভাগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে ডাক্তার লতিফুর রহমান, (এমবি, কলকাতা, ডিটিএম, কলকাতা), সিনিয়র হাউজ ফিজিশিয়ান হিসাবে ডাক্তার আব্দুল মান্নান, এমবিবিএস, ঢাকা), এবং জুনিয়র হাউজ ফিজিশিয়ান হিসাবে ডাক্তার নুরুল ইসলাম (এমবিবিএস, ঢাকা), ডা. মনসুর আলম (এমবিবিএস, কলকাতা), ডাক্তার খন্দকার আহসান আহমেদ (এমবিবিএস) ছিলেন। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 167.) সাধারণত চূড়ান্ত এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের ১২টি তাত্ত্বিক লেকচার ও ২১টি

ক্লিনিক্যাল লেকচার দেওয়া হতো। ও ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হতো। বক্ষব্যাধি রোগীদের জন্য কোনো অভ্যন্তরীণ ওয়ার্ড না থাকায় এ সময়ের কোনো উদাহরণ দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগে ১,৩২৬ জন নতুন রোগী এবং ৩,১৮৫ জন পুরাতন রোগীর সেবা প্রদান করা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 167.)

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বিশ্ববিদ্যালয় স্টাফ ও ছাত্রদের জন্য অন্তত ১০টি শয্যা সংরক্ষণে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। (*Executive Council 1951-52, University of Dacca*, 27 October 1951, p. 3.) ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিনের অধীন হওয়ায় এই প্রস্তাব করা হয়। হাসপাতালে বহির্বিভাগগুলো তখনও অস্থায়ী ছাউনিতে অবস্থিত ছিল। বিভাগগুলো রোগীদের ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকত। এগুলো বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সময় মিডওয়াইফারি ও গাইনোকোলজি বহির্বিভাগে রোগীদের সংখ্যা যথেষ্ঠ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালের শেষের দিকে প্রসুতি ক্লিনিক বা এন্টিনাটাল ক্লিনিক নামে একটি আলাদা বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়।। পূর্ববর্তী বছরের মতো প্রসূতি ও নানারকম স্ত্রীরোগের চিকিৎসা করা হতো। এছাড়া গভবর্তী মহিলাদের নিয়মিত পরীক্ষা করা হতো। ক্যানসারের রোগীদের রোগ নির্ণয়ের জন্য পাপানিকোলার স্টেনিং পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। এ সময় এই বিভাগে মোট ৬৬৪৫ জন নতুন রোগী এবং ৭৮০৯ জন পুরাতন রোগী চিকিৎসা করা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 181.) অন্যদিকে মেডিকেল ইউনিটের বহির্বিভাগে রোগীদের সংখ্যা ১৯৫০-৫১ সালের চেয়ে ব্যাপক হ্রাস পায়। এ সময় মোট নতুন ও পুরাতন রোগীর সংখ্যা ছিল ৮০,৫৬৯ জন। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 168.) তবে ১৯৫০-৫১ সালের মতো বিভিন্ন ধরনের রোগের চিকিৎসা করা হতো। এ সময় কার্ডিওলজিস্ট ছিলেন ডাক্তার এ কে শামসুদ্দিন আহমেদ, এমবি (কলকাতা), এমআরসিপি (লন্ডন) এমআরসিপি (এডিনবার্গ), এফআরএসএম (লন্ডন)। এই ওয়ার্ডে ৮৮ জন রোগী ভর্তি হয়। তার মধ্যে ৮০ জনকে হাসপাতাল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এ সময় ৭২ (৯০%) জন রোগী আরোগ্য লাভ করে, ১ (১.২%) জন রোগীকে শারীরিক ঝুকি থাকা অবস্থায় হাসপাতাল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়, ৪ জন সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় এবং ১ (১.২৫%) জন রোগীকে মেডিকেল বোর্ডের সিদ্ধান্তের জন্য পাঠানো হয় এবং সম্পূর্ণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর হাসপাতাল ছাড়ার অনুমতি দেওয়া হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 166.)

কে এ ছাড়া এই ওয়ার্ডে রোগীদের ইসিজি ও বিএমআর (basal metabolic rate)-এর মতো উন্নত ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ সময় ২৫০ জন রোগীকে ইসিজি এবং ২৫ জন রোগীর বিএমআর করা হয়। এগুলোর মাধ্যমে রোগীদের অনেক ধরনের বিশেষ পরীক্ষা করা হয়। হাসপাতালের অনেক রিওমেটিক কার্ডিটিস রোগীদের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ডেমনস্ট্রেশন করে দেখানো হতো। মূলত কলেজের শিক্ষার্থীদের কার্ডিওলজিক্যাল রোগী পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান করত। এভাবে এই ওয়ার্ডটি একদিকে কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা শিক্ষা দিত, অন্যদিকে পূর্ববাংলার কার্ডিওলজি রোগীদের বিশেষ সেবা তথা উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ করত। অন্যদিকে ১৯৫১-৫২ সালে অপথালমোলজি বিভাগে ২৭,৪৮৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে ৮৩৬ জন রোগীর হাসপাতালে থাকা জরুরি ছিল। হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও অভ্যন্তরীণ বিভাগে নিম্নলিখিত রোগীর অস্ত্রোপচার হয়, (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 166.)

অভ্যন্তরীণ বিভাগ	৭৯৪ জন
বহির্বিভাগ	৪৭৬ জন।
মোট	১২৭০ জন।

এ সময় চোখের অনেক জটিল রোগের চিকিৎসা করা হয়। একজন দৃষ্টিশক্তি হারানো মিথাইল এলকোহল এমব্লিওপিয়া (mythyl alcohol amblyopia) রোগীকে গ্লুকোজ, ক্যালসিয়াম ইস্টনস (easton's) সিরাপ ভিটামিন ইত্যাদি দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এর ফলে রোগী তার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়। অপরদিকে উভয় চোখের মধ্যে অথবা চারপাশের পেশিতে পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে সেলিসিলেট (salicylates) এবং পেনিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা করানো হলে আংশিকভাবে ভাল হতো। এক শিশুর পিটুইটারির টিউমারের কারণে চোখের সমস্যা পাপিলডেমা (papillaedema) হয়, কিন্তু পিটুইটারির অস্ত্রোপচার করা হলেও সফল হয়নি। এ সময় টেড়া চোখ অস্ত্রোপচার দ্বারা ভালো করা হতো। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 176.)

হাসপাতালের অতিরিক্ত বা এডিশনাল ফিজিশিয়ানের ওয়ার্ড একটি পুরুষ ও একটি মহিলা ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ছিল। ৩০টি শয্যা নিয়ে পুরুষ ওয়ার্ড ও ১০টি শয্যা নিয়ে মহিলা ওয়ার্ড গঠিত ছিল। এ ছাড়া রোগীদের সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৫-২০টি অতিরিক্ত শয্যা ও ৮-১২টি কেবিন ছিল। এই ওয়ার্ডে কলেজের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও সংক্ষিপ্ত এমবিবিএস কোর্সের শিক্ষার্থীদের দুই মাসের জন্য পাঠানো হতো এবং পূর্ববর্তী বছরের (১৯৫০-৫১) মতো নির্দেশনা দেওয়া হতো। শিক্ষাদান ছাড়াও ওয়ার্ডে নিম্নবর্ণিত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 137.)

মোট চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা	১,০৩৮ জন
মোট আরোগ্য লাভ রোগীর সংখ্যা	৫৫৯ (৫৩.৮%)
মোট অব্যাহতি প্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	২৭০ (২৬%)
মোট অন্যান্য রোগীর সংখ্যা	১৫৬ (১৫%)
মোট মৃত্যু	৫৩ (৫.২%)

এ ছাড়া এই ওয়ার্ডে নিম্নোক্ত কিছু গুরুতর জটিল রোগ ফটোগ্রাফি এবং ফটোমাইক্রোগ্রাফি দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা হয়, (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, pp. 182-84.)

১. জন্মগত হার্টের রোগ-ফেলোটস টেট্রোলজি (fallot's tetralogy)
২. ক্লিপেল (klippel)- ফাইল (feil) সিন্ড্রোম (syndrome)
৩. স্মলস ডিজেনারেশন (smohrls degeneration)
৪. সিমন্ডস ক্যাচেক্সিয়া (simmonds cachexia)

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভবনের এক অংশের ছাদের ওপর নতুন কেবিন নির্মাণ করা হয়। ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সাল থেকে রোগীদের জন্য ১৭টি কেবিনের ব্যবস্থা করা হয় এই কেবিনগুলো হাসপাতালের নিচের তলায় ও প্রথমতলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। এসব কেবিনের দৈনিক ভাড়া ৮ রুপি (প্রতি রোগী) অন্যদিকে নতুন ২২টি কেবিন দ্বিতীয়তলায় নির্মাণ করা হয়। এই কেবিনগুলো আরো সাজসরঞ্জাম সজ্জিত, আরো আধুনিক এবং সংযুক্ত বাথরুম ছিল। কেবিনের প্রতিদিনের ভাড়া ছিল ১২ রুপি (প্রতি রোগী)। এর সাথে ডাক্তারদের জন্য বিনামূল্যে খাবার ও পরিদর্শনের ভাড়া দেওয়া হতো। এভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে ৫০২ জন রোগীর জন্য শয্যার ব্যবস্থা করা হয়। তবে এটি চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল। তাই হাসপাতালে ৫০ থেকে ১০০টি অতিরিক্ত শয্যার ব্যবস্থা করা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 137.) অন্যদিকে ১৯৫২ সালের ২১ জানুয়ারি বহির্বিভাগে মানসিক রোগ বিভাগ খোলা হয়। একই বছরের ৮ অক্টোবর ২১ শয্যা নিয়ে পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড খোলা হয়। এ বছরের শেষের দিকে অবসটেট্রিকস ও লেবার ওয়ার্ড নিচের তলায় স্থানান্তর করা হয়। এ সময় থেকে প্রসূতি রোগীদের জন্য একটি জরুরি কক্ষ, কেবিন, একলামসিয়া

ওয়ার্ড, নার্সারি, প্রসবকালীন ও প্রসব পরবর্তী ওয়ার্ড নিয়ে একটি নিজস্ব প্রসুতি বিভাগ চালু হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 137.)

১৯৫১-৫২ সালে এডিশনাল সার্জনের ওয়ার্ডে ৯৩০ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এর মধ্যে আরোগ্য লাভ করে ৮৭২ জন এবং ৫৮ জনের মৃত্যু হয়। ৬৯৫ জন রোগীর অস্ত্রোপচার (বড় ২৫২টি এবং ছোট ৪৪৩টি) করা হয়। অস্ত্রোপচারে মৃত্যুর হার ১.৭%। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 137.) এসময় টিউমার, মাংসপেশি, হাড়ের রোগ ইত্যাদি, যকৃত, অগ্নাশয়, প্লীহা ইত্যাদি, অ্যাপেনডিসাইটিস, মুত্রধার, প্রণালী, কোষ বৃদ্ধি রোগ (হাইড্রোসিল), থাইরয়েড, হার্নিয়া, স্তন, খাদ্যনালীর সমস্যা, ফাইলেরিয়া, ফুসফুসের রোগ, আঘাত জনিত সমস্যা এবং অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা হয়। এভাবে দেখা যায় যে, ১৯৫১-৫২ সালে হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ তথা গাইনোকোলজি, মেডিকেল, সার্জিক্যাল, অপথালমোলজি, দন্ত, ইএনটিসহ, চর্ম ও যৌন, বক্ষব্যাধি এবং বিভিন্ন ধরনের রোগীর আধুনিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা করা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, pp. 182-84.) এ সময় রোগীদের পূর্বের মতো বিশেষ বিশেষ সেবা প্রদান করা হয়। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, p. 182-84.) এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মোট অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ১,৮৮,৯৪৩ জন (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, pp. 182-84.) এবং হাসপাতালের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৭৮৯,৪০০ রুপি। (Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *1951-52*, pp. 182-84.) এছাড়া প্রতিবছর প্রতিরোগী জন্য ব্যয় হতো ১৬৯ রুপি। সরকারি নথিতে ১৯৫২ সালের ২৮ অক্টোবরের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রতিদিনের প্রতিটি ওয়ার্ডের রোগীদের শয্যা সংখ্যা ও রোগীর সংখ্যার নিম্নোক্ত একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, (*B. Proceedings*, B. No. 125, *Public Health* and *Local Self-Government Department, Medical Branch*, 1953.)

ক. মেডিকেল ওয়ার্ড

ওয়ার্ডের নাম	অনুমোদিত শয্যা	প্রতিদিনের গড় রোগীর সংখ্যা	অতিরিক্ত রোগী
ওয়ার্ড নং-১	৩০	৪৫	১৫
ওয়ার্ড নং-২	৩০	৫১	২১
ওয়ার্ড নং-৭	৩০	৫১	২১
ওয়ার্ড নং-৯ (মহিলা)	৩০	৫৪	২৪
ওয়ার্ড নং-১২	৮	১০	২
ওয়ার্ড নং-১৩	১০	১৪	৪
মোট	১৩৮	২২৫	৮৭

খ. সার্জিক্যাল ওয়ার্ড

ওয়ার্ডের নাম	অনুমোদিত শয্যা	প্রতিদিনের গড় রোগীর সংখ্যা	অতিরিক্ত রোগী
ওয়ার্ড নং-১৪	৩০	৪৩	১৩
ওয়ার্ড নং-১৫	৩০	৪০	১০
ওয়ার্ড নং-১৬	৩০	৩৫	৫
ওয়ার্ড নং-১৭	৩০	৩০	-
ওয়ার্ড নং-৮	৩০	৩০	-

ওয়ার্ড নং-৫	৬	৭	১
ওয়ার্ড নং-৬	১০	১২	২
মোট	১৬৬	২০৭	৪১

গ. অপথালমোলজিক্যাল ইউনিট

	অনুমোদিত শয্যা	প্রতিদিনের গড় রোগীর সংখ্যা	অতিরিক্ত রোগী
এসেপটিক (পুরুষ)	১৩	১৩	-
এসেপটিক (মহিলা)	৮	১০	২
সেপটিক পুরুষ	১৫	১৬	১
সেপটিক মহিলা	২	২	-
মোট	৩৮	৪১	৩

ঘ. জরুরি ওয়ার্ড	১৪	১৪	-
ঙ. ধাত্রীবিদ্যা ওয়ার্ড	৪০	৬৭	২৭
চ. প্রসূতি ওয়ার্ড	৩০	৪৭	১৭
ছ. কেবিন	৩৮	৩৮	-
জ. শিক্ষার্থী ও নার্সদের অসুস্থ কক্ষ	১২	১২	-
মোট	১৩৪	১৭৮	৪৪
সর্বমোট	**৪৭৬**	**৬৫১**	**১৭৫**

উপরের তালিকা দেখে বোঝা যায় যে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনুমোদিত শয্যার সংখ্যার চেয়ে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল। ওয়ার্ড নং-১ এ অনুমোদিত শয্যা ৩০টি হলেও রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৫। অর্থাৎ ১৫ জন অতিরিক্ত রোগী ছিল। এভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে শয্যার চেয়ে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল। ফলে হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স থেকে শুরু করে সবার ওপর অতিরিক্ত চাপ ছিল। কখনও কখনও রোগীদের ওয়ার্ডে ভর্তি হতে বিলম্ব ও অপেক্ষা করতে হতো। এর প্রধান কারণ ছিল আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং চাহিদা অনুযায়ী সেবার অপ্রতুলতা। একই বছরের ৩১ অক্টোবর এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ চৌধুরী বলেন,

> Sometimes such chronic cases as can wait have to wait for a few days till beds are available for them in the hospitals. Acute and emergent cases are, however, admitted when they come, making even arrangement for extra beds whenever it is possible. (*Assembly Proceedings* (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly*, (Ninth Session), 1954, P. 27.)

১৯৫২ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসা শুরু হলেও ক্যানসার চিকিৎসার আধুনিক পদ্ধতি তখনও চালু হয়নি। এ সময় অস্ট্রেলিয়াতে আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যানসার চিকিৎসা করা হতো। পূর্বে যেখানে ক্যানসার চিকিৎসায় সার্জারিই ছিল একমাত্র অবলম্বন। অস্ট্রেলিয়ার ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা সার্জারি ছাড়াই রেডিয়াম, ডিপ-এক্সরে, মাস্টার্ড গ্যাস দ্বারা ক্যানসারের চিকিৎসা করত। তাই পূর্ববাংলার লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য এই ব্যাপারে বলেন,

> I suggest that in Dacca (East Bengal) there should be established a properly designed, equipped and staffed institute which would serve not only the capital city but the whole of the province. Within this institute should be provided facilities for surgery, radium, deep-X Rays and mustard gas treatment. (*Assembly Proceedings* (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly*, (Ninth Session), 1954, P. 314.)

উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এক্স-রে বিভাগ খোলা হলেও পুরোপুরি আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত করা হয়নি। ১৯৪৮ সালে আধুনিক ডিপ-থেরাপিসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি আমেরিকা থেকে ক্রয় করা হলেও ত্রুটি থাকার কারণে চালু করা সম্ভব হয়নি। এই বিভাগে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সবধরনের সাধারণ রেডিওগ্রাফির কাজ কাজ হতো। তখনও এনজিওগ্রাফি, ভেনডিকলোগ্রাফির কাজ শুরু করেনি। তবে বিভাগটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুসজ্জিত করার জন্য প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় ছিল। অপরদিকে একই বছর অক্টোবর মাসে ইলেকট্রোথেরাপেটিক বিভাগ খোলা হলে সেখানে ডায়াথেরাফি, আল্ট্রাভায়োলেট, ইলেকট্রেগ্রাফি ব্যবহারের দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়। একইভাবে এই বিভাগটিও আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে ষাটের দশকে হাসপাতালটি আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যানসার রোগের চিকিৎসার জন্য যুগপোযোগী হয়। ১৯৬৩ সালের *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যে,

> পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র ৪টি ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে। তার মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কেন্দ্রটিই আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত। (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৬৩)

যাহোক ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল নার্সিং। দেশ বিভাগের সময়ে বেশিরভাগ নার্স পশ্চিমবঙ্গে চলে যায় এবং কিছু সংখ্যক তাদের জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, নার্সিং প্রশিক্ষণে ১৬২ জন ভর্তি হয়। তার মধ্যে ৯৩ জন চলে যায় এবং বাকি ৬৯ জন সেবা প্রদান করে। (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946-52*, p. XIX.) *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণী* থেকে জানা যায় যে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ম্যাট্রন পদ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অনুমোদনকৃত নার্সের সংখ্যা ১২৩ জন হলেও হাসপাতালের নার্সের সংখ্যা ছিল ৪৬ জন। ১৯৪৮-৪৯ সালে ম্যাট্রন পদসহ অনুমোদনকৃত নার্সের সংখ্যা ১২৪ জন হলেও নার্সের সংখ্যা ছিল ৫৭ জন। অন্যদিকে ১৯৪৯-৫০ সালে অনুমোদনকৃত মোট নার্সের সংখ্যা ৬৭ জন এবং এ সময় হাসপাতালে মোট নার্সের সংখ্যা ১২৪ জন। ১৯৫০-৫১ সালে অনুমোদনকৃত মোট নার্সের সংখ্যা ১০০ জন এবং হাসপাতালে মোট নার্সের সংখ্যা ১২৪ জন। অপরদিকে ১৯৫১-৫২ সালে অনুমোদনকৃত নার্সের সংখ্যা ম্যাটরনসহ ১১৬ জন এবং হাসপাতালে মোট নার্সের সংখ্যা ১২৪ জন। (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946-52*, p. XIX.) ম্যাটরন পদটি ১৯৪৭-৪৮, ১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১ খালি ছিল। এভাবে ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নার্সের সংখ্যা কম থাকলেও পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রথম দিকে মুসলিম সম্প্রদায় থেকে যথেষ্ট সংখ্যক নার্স আসত না। যাদের জীবিকা অর্জনের জন্য অন্য কোথাও কোনো উপায় ছিল না এবং কঠিন সমস্যার মধ্যে তারা এই পেশাকে বেছে নিত। এ সময় পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের খ্রিস্টান মেয়েরা এ পেশা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল। উপরন্তু নার্সিং প্রশিক্ষণ নেওয়া আগ্রহী প্রার্থীদের নার্সিং শিক্ষায় চরম দুর্বল ছিল। দেশ বিভাগের আগে নার্সিং স্কুলে ভর্তির যোগ্যতা ছিল মেট্রিকুলেশন পাশ কিন্তু দেশ ভাগের পরে এর মান শিথিল করা হয়। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ করা মেয়েদের নার্সিং পেশায় নেওয়া হয়। ফলে এসব মেয়েদের কারো কারো

নার্স হওয়ার তেমন যোগ্যতা ছিল না। আবার কেউ কেউ ভালো করত, কিন্তু নার্সিং ক্ষেত্রে সার্বিক ফলাফল সন্তোষজনক ছিল না। অথচ একই যোগ্যতার অন্য পেশার মহিলাদের সাথে তাদের তুলনা করলে দেখা যায় যে, তাদের বেতনভাতা, আবাসিক ব্যবস্থা, খাদ্য ও বস্ত্রের ব্যবস্থা অন্যদের চেয়ে সন্তোষজনক ছিল। তাদের বেতনভাতা সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত কেরানিদের চেয়েও ভালো ছিল। (*Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946-52*, p. XIX.) পরবর্তীকালে নার্সিং ক্ষেত্রে যে সংকট ছিল তা অনেকটা দূর হয়। এরপর মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায় থেকে নার্সিং পেশায় আসতে শুরু করে।

১৯৫২ সালের সরকারি নথি থেকে জানা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মিস ডি এম রিস কে ঢাকার প্রিলিমিনারি নার্সিং স্কুলের সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অর্থাৎ তিনি একাধারে পূর্ববাংলার নার্সিং স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ম্যাটরন হিসাবে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতেন। এজন্য সরকারি বিশেষ আদেশ অনুসারে (আদেশ নং- ১৪১৫, ৬ জুন ১৯৪৯) প্রতিমাসে ১/৫/- ভাতা হিসাবে বেতন প্রদানের অনুমতি দেওয়া হয়। (*B. Proceedings*, B. No. 126, Public Health and *Local Self-Government Department, Medical Branch,* 1953.) এ সময় ম্যাটরনের বেতনস্কেল ছিল ৩৫০/২৫/২-৪৫০ রুপিসহ দৈনিক খাবার ভাতা ১/৪ রুপি, প্রতিমাসে ধোপা ভাতা ৫ রুপি এবং প্রতিমাসে ইউনিফর্ম ভাতা ৫ রুপি ছিল। অন্যদিকে নার্সিং সুপারিনটেনডেন্টের বেতন ছিল ৩০০/২০/৪০০ রুপি। ফলে দুইটি পদের জন্য একই ভাতা বরাদ্দ ছিল। তাই দুইটি পদকে একত্রিত করে উপরিউক্ত ভাতার চেয়ে বেশি তথা ৪৫০/২০/৫৫০ রুপি বেতন স্কেলে একটি পদ সৃষ্টি করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু পদ দুটিকে একত্র করা সম্ভব ছিল না। তাই নতুন পদ সৃষ্টির পরিবর্তে অন্য দায়িত্ব পালনের জন্য ম্যাটরনকে বিশেষ বেতন দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এরপর থেকে ম্যাটরন পদের বেতন সংশোধন করা হয় এবং ৩৫০/১৫-৫০০ তে একটি উঁচু স্কেল করা হয়। ১/৫ ভাগের সমান একটি বিশেষ বেতনের অর্থ হলো ৪২০/৬০০ বেতন স্কেলের মতো যা চিকিৎসা বিভাগের পরামর্শে করা হয়। (*B. Proceedings*, B. No. 126, 1953.) হাসপাতালের কার্যক্রম আধুনিক, সঠিক, সুশৃঙ্খল করার জন্য পূর্ববাংলা সরকার সবধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। তাই সময় ও চাহিদার সাথে মিল রেখে ধীরে ধীরে হাসপাতালকে আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা করা হয়। কখনও কখনও চাহিদা অনুযায়ী সুযোগসুবিধা অপ্রতুল থাকলেও হাসপাতালের আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া থেমে ছিল না। বরং বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের হাসপাতালের আধুনিকরণ প্রক্রিয়ার সাথে মিল রেখে এর উন্নয়ন অব্যাহত ছিল।

১৯৫২ সালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৩০০ জন নিম্ন শ্রেণির কর্মচারী ছিল। এদের বেশিরভাগই অদক্ষ ছিল, তবে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু তাদের সামাজিক অবস্থা তথা শিক্ষা, সংস্কৃতি, বুদ্ধিবৃত্তি, অভ্যাস, শৃঙ্খলা মানার প্রবণতা ইত্যাদি সন্তোষজনক অবস্থায় ছিল না। যে কারণে সবাই (প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী রোগী, জনসাধারণ) তাদের ওপর অসন্তোষ ছিল। ১৯৪৬-৫২ সালের *ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বার্ষিক বিবরণী*তে তাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়-

> Unless this class of people learnt to be more responsible this unfortunate state is expected to persist. (*Annual Report of the DMCH for the year 1946-52*, p. XVIII.)

নিচু শ্রেনীর এই কর্মচারীদের আচার আচরণ সম্পর্কে বর্তমান সময়েও নানারকম অভিযোগ পাওয়া যায়। কর্তব্যে অবহেলা ও নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতি সচেতন না থাকায় চিকিৎসক, রোগী তথা সবাইকে নানা রকম সমস্যা পড়তে হয়। এর ফলে অনেক সময় হাসপাতালের সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। এ সময় (১৯৫৩ সালের ২৪ আগস্ট) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হাউজ সার্জন ও হাউজ ফিজিশিয়ানের দায়িত্ব সম্পর্কে স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী তোফাজ্জেল আলী থেকে জানা যায়। তাদের দায়িত্ব

হলো পরিদর্শক, সার্জন এবং চিকিৎসকদের সহায়তা করা। এর পাশাপাশি জুনিয়র হাউজ সার্জন ও জুনিয়র চিকিৎসকদের জরুরি দায়িত্ব পালন করা। হাউজ সার্জনরা হাসপাতালের মধ্যে বসবাস করতে বাধ্য। কারণ তারা হাসপাতালের বাইরে থাকলে হাসপাতালের কাজ সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত হতে পারে না। ১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভেতরে ৭ জন এবং সমান সংখ্যক হাউজ সার্জন আবাসিক কোয়ার্টারের বাইরে থাকত। এ সময় হাসপাতালের নিকটে এই হাউজ সার্জনদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। হাসপাতালে থাকা রোগীদের জন্য খুবই দরকার ছিল। তাছাড়া এ সময় হাসপাতালের অনেক চিকিৎসক বাইরে অধিক সময় কাটাতেন। তাতেও হাসপাতালের কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হতো। (*B. Proceedings*, B. No. 125, *Medical Branch*, 1953.) ইতোপূর্বে ১৯৫০ সালে পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিলের পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ যখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ পরিদর্শন করেন তখন তারা দেখতে পান যে, ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফিক এবং এক্স-রে বিভাগের চিকিৎসক বিভাগের বাইরে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। এজন্য পরিদর্শন কমিটির সদস্যগণ আপত্তি জানায় এবং তাঁকে এই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্রাকটিসকে অনুমোদন হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এটি মেডিকেল অফিসারদের স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বড় বাধা। উপরন্তু এটি সরকারি কর্মচারীদের নির্দেশিত আইন-১৫ এর নিয়ম লঙ্ঘন করা। যার দ্বারা একজন সরকারি কর্মচারী কোনো ব্যবসা বাণিজ্যে যুক্ত থাকতে পারবে না। অথবা জনকল্যাণমূলক নিজ দায়িত্ব ব্যতীত অন্য কোনো চাকুরিতে নিয়োজিত থাকতে পারবে না। (*B. Proceedings*, B. No. 104, *Medical Branch*, 1950, pp. 1-2.)

এরূপ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান সরকার বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রাইভেট প্রাকটিস করার জন্য ক্লিনিক ও নার্সিং হোম রক্ষণাবেক্ষণে অনুমতি প্রদান করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। তাই প্রাইভেট প্রাকটিস বন্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এই ব্যাপারে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব ইব্রাহীম ধামী আসকোয়ার পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের সচিবকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রাইভেট চিকিৎসা সর্ম্পকে তথ্য সরবরাহের জন্য প্রাদেশিক সরকার এক আদেশ জারি করেন। হাসপাতালের প্রত্যেক চিকিৎসক কিভাবে প্রাইভেট প্রাকটিস করেন এবং এর ফলে হাসপাতালের কোনো ক্ষতি হয় কিনা, তা জানানোর জন্য চিকিৎসকদের তদন্ত করার অনুরোধ করা হয়। প্রাদেশিক সরকার যে আদেশ জারি করেন তাতে বলা হয়, ডাক্তারদের প্রাইভেট প্রাকটিস সরকারি রীতির বিরুদ্ধে এবং সরকারি কাজে নিযুক্ত থেকে কারো সরকারি কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবার অধিকার নেই। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ. শেষ।) তাছাড়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ের ওপর তদন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়। বিশেষ করে চিকিৎসকগণ রোগীদের নিকট হতে কোনো ফি গ্রহণ করেন কিনা এবং করলে তা কীভাবে করেন, ভর্তির ব্যাপারে কোনো রোগীকে বাড়িতে নিয়ে টাকা আদায় করা হয় কিনা, রোগীরা হাসপাতালে আসলে তাদের চিকিৎসার জন্য কোনো চিকিৎসক বাড়িতে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় কিনা, ভর্তির ব্যাপারে গড়িমসি করা হয় কিনা, রোগীর বিনা অনুমতিতে তাকে দিয়ে ডেমনস্ট্রেশন দেওয়া হয় কিনা, চিকিৎসকগন সময়মত হাসপাতালে উপস্থিত থাকেন কিনা, কোনো চিকিৎসক ভর্তি এবং অনুরূপ ব্যাপারে রোগীর নিকট হতে টাকা নিলে তা ঘুষ বলে বিবেচিত হওয়া। কোনো চিকিৎসকের বাড়িতে ল্যাবরেটরি আছে কিনা, এটা কি আকারের ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তথ্য দেওয়ার জন্য চিকিৎসকদের জানানো হয়। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ. শেষ।) মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসার পরিবেশ যাতে সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুসারে হয়, তাই উল্লিখিত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই হাসপাতালে পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের সর্বসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এই হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল সবচেয়ে আধুনিক ও বিশ্বমান সম্মত। কোনো রোগী যেন চিকিৎসকদের কর্তব্য অবহেলার কারণে বিনা চিকিৎসায় না থাকে,

হাসপাতালের সুনাম ক্ষুণ্ন না করে এবং চিকিৎসকদের নীতি নৈতিকতার বিষয়ে সচেতন হওয়ার জন্য তৎকালীন সরকার আইন জারির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় নানা রকম খবর প্রচারিত হতে থাকে। এজন্য তৎকালীন সরকার এক কমিশন নিয়োগ করেন এবং সার্জন জেনারেলকে এই সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। সরকারের নির্দেশ অনুসারে সার্জন জেনারেল তদন্ত কাজ পরিচালনা করেন। সদ্য প্রতিষ্ঠিত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসার মান বিশ্বমান সম্মত করার জন্য এবং এর ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ধারা চলমান রাখার জন্য উপরিউক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়। উল্লেখ্য এই আইনের আওতায় সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকগন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই হাসপাতালে মারাত্মক, জটিল রোগ এবং দুর্ঘটনাজনিত আঘাতপ্রাপ্ত রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হতো। সাধারণত রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য ইমার্জেন্সি কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত রোগী, শ্বাসকষ্ট, বিষক্রিয়া (poisoning) সাধারণ জ্বর, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল (gastrointestinal) সমস্যার মতো রোগীদের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন ছিল না। তাদেরকে সাধারণত হাসপাতালের বহির্বিভাগে উপস্থিত থেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হতো। ইমার্জেন্সি কক্ষে আর্টারি ফোরসেপ (artery forceps), স্ক্যাল্পেলস (scalpels), সিজার (scissors), স্টিচিং নিডল (stiching needle), ক্যাটগাট (catguts), ড্রেসিং উপকরণ, মাউথ গ্যাগ (mouth gag), ইনজেকশন, সিরিঞ্জ ইত্যাদি যন্ত্রপাতি দ্বারা রোগীর ছোট অপারেশন করা হতো। তবে এই কক্ষে কোনো অ্যাজাসিটিস্ট ছিল না। সাধারণত স্থানীয় অ্যানাসথিসিয়ার মাধ্যমে এই অপারেশন করা হয়। এই কক্ষের দায়িত্বে থাকা ইপিএমএস (উঁচু) এর অফিসারদের সিনিয়র হাউজ অফিসার হিসাবে প্রায় ২ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত অভিজ্ঞতা ছিল। এ সময় হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীসহ মোট চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ৪৭,৯৩৬ জন। (*B. Proceedings*, B. No. 125, *Medical Branch,* 1953, p. 1.) সরকারি কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, দেশ বিভাগের পর থেকে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮,৬৯৩ জন রোগীর অপারেশন করা হয়। এর মধ্যে ১৮,৩২৭ জন রোগীর অপারেশন সফল হয় এবং ৩৬৬ জন রোগীর অপারেশন ব্যর্থ হয়। অপারেশনের কারণে ৫জন রোগীর মৃত্যু হয়। (*B. Proceedings*, B. No. 125, *Medical Branch,* 1953, p. 6.) এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৪৯ জন সার্জন উক্ত অপারেশন পরিচালনা করে। (*B. Proceedings*, B. No. 125, *Medical Branch,* 1953, pp. 6-7.)

১৯৫২ সাল পর্যন্ত ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কোনো এক্স-রে চিকিৎসা করা হতো না। কেবল এক্স-রে ডায়াগনস্টিক কাজ করা হতো। এ কাজটি সম্পাদন করতেন অভিজ্ঞ রেডিওলজিস্ট ডাক্তার হাবিল এরিক ফোরফোটা (doz. dr. med. habil erich forfota)। ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে আমেরিকার ডায়াগনস্টিক যন্ত্র (২৫০ এম.এ ফিলিপস আমেরিকান ইউনিট) ও অন্যান্য তিনটি ক্ষুদ্র যন্ত্র স্থাপন করা হয়। (*B. Proceedings*, B. No. 125, *Medical Branch,* 1953, p. 5.) ইতঃপূর্বে ১৯৪৮ সালে আমেরিকা থেকে একটি ডিপ-থেরাপি কেনা হয়। পরিবহণের সময়ে যন্ত্রটি নষ্ট হয়ে যায়। লাহোরের একজন প্রকৌশলী যন্ত্রটি স্থাপন করে, কিন্তু যন্ত্রটির বৈদ্যুতিক চেক আপ এর জন্য একটি পোল ট্রান্সফর্মার তৈরি করা যায়নি। ইতোমধ্যে অর্ডার দেওয়া হলে ট্রান্সফর্মার তখনও পাওয়া যায়নি। এ সময় ডিপ-থেরাপি নষ্ট হলেও অন্যান্য ডায়াগনস্টিকের কাজ অন্যান্য এক্স-রে মেশিনে করা হতো। অন্যদিকে ২০০ এম এ ডায়াগনস্টিক আরেকটি যন্ত্র অচল অবস্থায় কয়েক মাস পড়েছিল কারণ যন্ত্রটির টিউব ত্রুটিযুক্ত ছিল, তবে টিউবের জন্য অর্ডার দেওয়া হয়। এরূপ অবস্থায় হাসপাতালের জরুরি রোগীদের তাৎক্ষণিকভাবে এক্স-রে করা হলেও সাধারণ রোগীদের হাসপাতালে নির্ধারিত নিয়মানুসারে যথাযথভাবে পরীক্ষা করাতে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নিতে প্রায় একদিন অপেক্ষা করতে হতো। (*B. Proceedings*, B. No. 125, *Medical Branch,* 1953, p. 5.) এর ফলে রোগীরা বিড়ম্বনার শিকার হতো।

সে সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ ধরনের সমস্যা চিহ্নিত হলেও দ্রুত এগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হয়।

এ সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বহির্বিভাগের রোগীদের চিকিৎসার জন্য ১৩টি বিভাগ ছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের জন্য আলাদা চিকিৎসক ছিল। এমএলএ মিসেস আনোয়ারা খাতুন এর এক প্রশ্নের জবাবে বিভাগ ও চিকিৎসকদের নাম জানা যায়। (*B. Proceedings*, B. No. 126, *Medical Branch,* 1953) এসব অফিসার প্রতিদিন বহির্বিভাগে নিজ নিজ বিভাগে উপস্থিত থাকেন। উপরিউক্ত অফিসার ছাড়াও পর্যায়ক্রমে সিনিয়র ভিজিটিং অফিসার প্রতিদিন বহির্বিভাগে তাদের নিজ নিজ বিভাগে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া এ সময় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগী আনা-নেওয়ার জন্য মাত্র দুইটি (২) অ্যাম্বুলেন্স ছিল। (*B. Proceedings*, B. No. 126, *Medical Branch,* 1953) এই হাসপাতালের উন্নয়নের জন্য ১৯৫৩-৫৪ সালের বাজেটে বেশি পরিমানে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এ সময় পূর্ববাংলার প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমীন লেজিসলেটিভ এসেম্বলিতে বলেন,

> Improvements to the Dacca Medical College and Hospital carried out during 1952-53 cost Rs 19,36,000 and a further expenditure of Rs 30,64,000 will have to be incurred next year to complete the project. Inspection of the Medical College has been completed in January last and it is hoped that the Pakistan Medical Council will shortly accord recognition to the college (recognition already accorded). (*Health Schemes of East Bengal,* 1953, pp. 5-7.)

১৯৫৩ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালর উন্নয়নের জন্য ৫০ লক্ষ রুপির প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। পাকিস্তান মেডিকেল কাউন্সিল কর্তৃক কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন ঘাটতি, অপর্যাপ্ততা চিহ্নিত করা হয়। কলেজের পাশাপাশি হাসপাতালের ঘাটতি দূর করা ও সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেওয়া হয়, কেননা কলেজের ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলো হাসপাতালে অবস্থিত। তাই হাসপাতালের ক্লিনিক্যাল বিভাগের অগ্রগতির সাথে কলেজের অগ্রগতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হাসপাতালের কোনো অংশের ঘাটতি মানে কলেজের ঘাটতি। হাসপাতালবিহীন একটি মেডিকেল কলেজ কল্পনা করা যায় না। এই প্রকল্পের অধীনে হাসপাতালের জন্য একটি নতুন বহির্বিভাগ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময় কলেজের প্রিন্সিপালের অফিস, গুদাম ঘর, লাইব্রেরি, ফার্মাকোলজি পরীক্ষার হল, প্যাথলজি, ফিজিওলজি ও কেমিস্ট্রি বিভাগের আলাদা ব্লক নির্মাণ এবং উক্ত স্থানে হাসপাতালের বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগ স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় ধরা হয় ১৬,৩৪,৯০০ রুপি। (*Health Schemes of East Bengal,* 1953, pp. 5-7.) হাসপাতালের নতুন রান্নাঘর ব্লক নির্মাণের জন্য ১,০৮,০০০ রুপি ধরা হয়। একই সাথে ব্যাচেলর স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের উদ্যোগ হাতে নেওয়া হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রকল্পের বাইরে প্রদান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। (*Health Schemes of East Bengal,* 1953, pp. 5-7.) অন্যদিকে পুরাতন সচিবালয় ভবনের যে অংশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশটি বিদ্যমান ছিল, তা মেডিকেল কলেজের কাছে হস্তান্তর করার পরে উক্ত স্থানে সংক্রামক ব্লক নির্মাণ এবং হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড স্থানান্তরের প্রস্তাব করা হয়। এজন্য আনুমানিক খরচ ধরা হয় ১০,০০,০০০ রুপি। (*Health Schemes of East Bengal,* 1953, pp. 5-7.)

পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে একটি নয়া ব্লক নির্মাণ, লেকচার থিয়েটার, রান্নাঘর নির্মাণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকৃত অংশে হাসপাতালকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেন। এছাড়া সংক্রামক ব্যাধির জন্য আলাদা ব্লক নির্মাণ, এর পাশাপাশি ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য বাসভবন তৈরি, ক্যান্টিন তৈরি প্রভৃতি ব্যবস্থা কার্যকর

করেন। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ সেপ্টম্বর ১৯৫৭, পৃ. ১) এ ব্যাপারে *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়,

> ১৯৫৮-৫৯ সালে মেডিকেল এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের উন্নয়ন কর্মসূচীর যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। ঢাকা মেডিকেল এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারন করা হইয়াছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের আউটডোর ডিপার্টমেন্ট, মেডিকেল স্টোর, নার্সদের হোস্টেল প্রভৃতির জন্য নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের প্যাথলজিকাল ব্যাকটেরিওলজিক্যাল এবং অন্যান্য বিভাগের উন্নয়ন ও সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করার কাজ অগ্রসর হইতেছে। কলেজের ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলো হাসপাতালের অপরিহার্য অংশ। হাসপাতালের অগ্রগতি ও উন্নয়ন হলো ক্লিনিক্যাল বিভাগের (সার্জারি, মেডিসিন, মিডওয়াইফারি, গাইনোকোলজি, অপথালমোলজি, ইএনটি) সাফল্যের সাক্ষ্য। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ৬)

১৯৫৯-৬০ সালের *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী*তে উল্লেখ করা হয়, পর্যালোচিত সময়ে হাসপাতালের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। যেমন, নতুন বহির্রোগী ব্লক, ক্যানসার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি চালু, শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি, জরুরি বিভাগের সম্প্রসারণ ইত্যাদি। অস্ত্রোপচার বিভাগে কিছু জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রোপচার হয়, যা পূর্বে কখনো হয়নি এবং পূর্ব পাকিস্তানে এটা সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অন্যান্য বিভাগ তাদের নিজ নিজ অগ্রগতি বজায় রাখে। (*Annual Report for 1959-60, University of Dacca*, p. 105)

১৯৫৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম হৃদপিন্ডের ওপর পরীক্ষামূলক অস্ত্রোপচার করা হয়। ফরিদপুর জেলার আব্দুস সোবহান নামে জনৈক ব্যক্তির হৃদপিণ্ডের মাইট্রোল স্টেনোসিস' রোগে ভুগছিলেন। হাসপাতালে উক্ত ব্যক্তি সহযোগী অধ্যাপক ডা. রব (এমআরসিপি) এর তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি রোগীর হৃদপিণ্ডের অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সার্জারির সহযোগী অধ্যাপক ডা. আনসারী (এফআরসিএস) এর নিকট প্রেরণ করেন। ডা. আনসারী একই বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি রোগীর হৃদপিণ্ডের ওপর অস্ত্রোপচার করেন, কিন্তু অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর মৃত্যু হয় এবং অস্ত্রোপচার ব্যর্থ হয়। এর কারণ হিসাবে বিশেষজ্ঞগণ জানান যে, অস্ত্রোপচার না করলেও উক্ত রোগীর মৃত্যু দুই একদিনের মধ্যে অবধারিত ছিল। (*দৈনিক ইত্তেফাক* ১ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ১) তবে এই অস্ত্রোপচার ব্যর্থ হলেও এটা ছিল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য মাইলফলক। এ অস্ত্রোপচারের মধ্য দিয়ে এ হাসপাতালে হৃদপিণ্ডসহ শরীরের অন্যান্য অঙ্গের জটিল ও মারাত্মক রোগের অস্ত্রোপচার করার যাত্রা শুরু হয়, যা পূর্ববাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে পূর্বে কখনো হয়নি। পরবর্তীকালে হাসপাতাল অত্যাধুনিক হতে থাকলে জনসাধারণ জটিল রোগের উন্নত চিকিৎসা পেতে শুরু করে। সে সময়ে কোনো অস্ত্রোপচারে ব্যর্থ হলে চিকিৎসকগণকে জবাবদিহি করতে হতো। চিকিৎসকের অবহেলা বা ভুলের কারণে অস্ত্রোপচার ব্যর্থ হয়েছে কিনা তা অনুসন্ধান করে দেখা হতো। চিকিৎসকের অবহেলার কারণে রোগীর মৃত্যু বা অস্ত্রোপচার ব্যর্থ হলে গর্হিত অপরাধ ছিল। সে সময় গুরুত্বসহকারে এই বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হতো। কখনো কখনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো। এমনি একটি ঘটনা *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়,

> ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে তিন বৎসর বয়স্ক বালক ফিরোজ মিয়ার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য ডা. রেফায়েতুল্লাহ, ডা. আলম ও ডা. এস.কে. সেন এর সমবায়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছেন। ডা. রেফায়েতুল্লাহকে আগামী পক্ষকালের মধ্যে তদন্ত কমিটির রির্পোট পেশের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ১)

এ সময় পাকিস্তান সরকার প্রাদেশিক মিউনিসিপ্যাল ও জেলা বোর্ড পরিচালিত হাসপাতালসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও দেশের মেডিকেল শিক্ষা কেন্দ্রীয়করণের ইচ্ছা পোষন করেন। তাই স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন শাখাকে সম্মিলিত করে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার তত্ত্বাবধানে আনার পরিকল্পনা করে। দেশের বড় বড় হাসপাতালসমূহকে সেনাবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। এই কর্মচারীদের পদমর্যাদা লেফটেন্যান্ট কর্নেল স্তর হতে করা হয়। হাসপাতালসমূহের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থার মন্থরগতি নিরসনের জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ জানু ১৯৫৯, পৃ. ১ শেষ)

এই ব্যাপারে তৎকালীন পাকিস্তানের স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী লে. জেনারেল ডব্লিউ এ বারকী বলেন, 'যথোপযুক্ত শাসন পরিচালনা এবং কার্য পরিচালনা সুশৃঙ্খল করার জন্যই এটা করা হয়েছে।' (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৬ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ২) ফলে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনে ৬টি আর্মি মেডিকেল কোরের অফিসারবৃন্দকে নিয়োগের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানের তিনটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও তিনটি বিভাগীয় সদর দফতরের মেডিকেল ও এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে নিয়োগ করা হয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী লে. কর্নেল এম এম হককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মেজর এ এফ এম বুরহান উদ্দিনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং মেজর খুরশীদ আহমদকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এডমিনিস্ট্রেটর হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানের এডমিনিস্ট্রেটরদের সমান ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁদের ওপর কলেজ ও হাসপাতালের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ এপ্রিল ১৯৫৯, পৃ. ১)

সাধারণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে নানা অব্যবস্থাপনা লক্ষ করা যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগের রোগী পরীক্ষানিরীক্ষার যন্ত্রপাতির অপ্রতুলতা নিয়ে নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। হাড়ের রোগের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, এক্স-রে প্লেট, 'বেরিয়াম মিল' এর অভাব। প্রায়ই বেরিয়াম মিল না থাকায় রোগীকে ফেরত পাঠানো হয়। ফলে একই রোগীকে অন্যদিন আবার একই কষ্ট ভোগ করতে হতো। অন্যদিকে দিন-রাত এক্স-রে করবার ব্যবস্থা না থাকায় জরুরি প্রয়োজনে রোগীকে বিলম্বের জন্য অনেক কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃ. ৫) 'ছাট বড় যেকোনো অস্ত্রোপচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ক্যাটগাট (catgut)। এর ওপর রোগীর অপারেশনোত্তর অবস্থা অনেকখানি নির্ভর করে। এগুলো খারাপ হলে রোগীর কষ্টের সীমা থাকে না। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে 'ক্যাটগার্ট ব্যবহৃত হতো অত্যন্ত নিম্নমানের ও সম্পূর্ন ব্যবহার অনুপযোগী। ফলে বহু রোগীর সেপটিক (Septic) হতো। এই ক্যাটগাট যাতে বিদেশ থেকে আমদানি করা না হয় তার জন্য হাসপাতালের চিকিৎসকগণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। এমনকি ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, রেজিস্ট্রার, চিকিৎসক পূর্ববাংলা সরকারের সার্জন জেনারেল টি ডি আহমেদ-কে অবহিত করা হলেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃ. ৫)

হাসপাতালের আরেকটি অন্যতম যন্ত্র হলো 'স্টেরিলাইজার'। অপারেশনের যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম স্টেরিলাইজার না করে ব্যবহার করলে রোগীর অপমৃত্যু নিশ্চিত, কিন্তু হাসপাতালে এটা প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য। মাত্র তিনটি যন্ত্র আছে, তার মধ্যে বড়টি সম্পূর্ণ বিকল, অন্যগুলো চালানোর জন্য টেকনিশিয়ানের ব্যবস্থা ছিল না। তাছাড়া রোগীদের জন্য ব্যবহৃত সমস্ত লিনেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা একান্ত অপরিহার্য। এই কাজে উপযুক্ত মেশিন এর ব্যবস্থা না থাকায় বর্ষাকালে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রায় ৮ বছর পূর্বে আনুমানিক ৮০-৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে একটি লন্ড্রি মেশিন কেনা হলেও এটা অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল। ব্রেন টিউমার জাতীয় রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য একটি মূল্যবান যন্ত্র হলো 'এ্যানকেফালোগ্রাফি'। অভিজ্ঞ লোকের অভাবে এই যন্ত্রটিও অব্যবহৃত অবস্থায় ছিল।

অন্যদিকে ক্যানসার রোগের জন্য ব্যবহৃত 'ডিপ-এক্স-রে থেরাপি' যন্ত্র সাড়ে ৪ কোটি (১৯৫৬) নাগরিকের একমাত্র স্বাস্থ্য রক্ষা কেন্দ্র ও পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেই। যন্ত্রটি মীর্জাপুরে অবস্থিত একটি বেসরকারি হাসপাতালে ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে রোগীদের সেখানে ভর্তি হওয়ার উপদেশ দেওয়া হতো, কিন্তু রোগীরা সেখানে যেতে আগ্রহী ছিল না। কারণ রাজধানীর হাসপাতালে চিকিৎসা না হওয়ায় তারা এই হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা নিতে ভরসা পেত না। আবার অনেকে গেলেও চিকিৎসা নিতে বিলম্ব হয়ে যেত। ফলে অনেকের অকাল মৃত্যু হতো। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃ. ৫)

এছাড়া মুত্রজনিত রোগ পরীক্ষানিরীক্ষা করার জন্য সিসটোস্কোপ (cestoscope), কণ্ঠনালির অপারেশন রোগ নির্নয়ে লেরিংগোস্কোপ (laryngoscope), শরীরের যে সমস্ত অঙ্গে অপারেশনের সময় সরাসরি ওপরে কাজ করা অসুবিধা সে সমস্ত অঙ্গের অপারেশনের কাজে হেডলাইট, রক্ত ও অন্যান্য তরল পদার্থ শুষে নেওয়ার কাজে তোয়ালে ব্যবহার না করে 'সাকার' (sucker) নামক যন্ত্র প্রয়োজন। কিন্তু এ সমস্ত যন্ত্র কিছুই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছিলনা। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ৯ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃ. ৫) এ বিষয়গুলো উল্লিখিত সময়ের সমস্যা ছাড়াও হাসপাতালের রোগীদের খাবার নিয়ে নানা অভিযোগ ছিল। রোগীদের মোটা চাল সরবরাহ করা হতো। এটা রোগীদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ছিল। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নেওয়ার আশ্বাস দেন। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১লা নভেম্বর ১৯৫৬) উপরন্তু মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন ডাক্তার ও অবৈতনিক জুনিয়র ডাক্তারদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া সংশ্লিষ্ট ধর্মঘট পালিত হলে হাসপাতালে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং রোগীরা ভোগান্তি শিকার হন। হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এসব চিকিৎসক। তাদের মাধ্যমেই হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড পরিচালিত হয়। তাদের পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা সেবায় রোগীরা থাকে। এ সময় চিকিৎসকগণ বিনামূল্যে আহার, বাসস্থান ও মাসিক ৭৫ টাকা ভাতার পরিবর্তে ১৫০ টাকা ভাতা এবং জুনিয়র চিকিৎসকগণ মাসিক ১৫০ টাকা বেতন ও প্রচলিত ভাতার দাবি করে। তারা ইন্টার্নশিপ বাধ্যতামূলক করা ও এমবিবিএস পাশ করার সাথে সাথে তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর দেওয়ার দাবিতে স্বাস্থ্য সচিবের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০ নভেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ৫)

এ সময় কর্ণেল গণি হায়দারের নেতৃত্বে একটি সামরিক মেডিকেল দল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং প্রদেশের মেডিকেল শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্তের পর তারা সরকারের নিকট রির্পোট দাখিল করেন। (*দৈনিক নাজাত*, ১২ মে, ১৯৫৯, পৃ. ১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও প্রদেশের অন্যান্য হাসপাতালের শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রাদেশিক সরকার কয়েকজন সামরিক অফিসারকে উল্লিখিত হাসপাতালের প্রশাসকরূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল বিভাগের রোগীদের অবস্থার তেমন পরির্বতন হয়নি। প্রতি ওয়ার্ডে রোগীর সংখ্যা স্বাভাবিক বরাদ্দকৃত সংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি। রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নার্স ও চিকিৎসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি। ফলে রোগীদের চিকিৎসা সেবা দেওয়া শোচনীয় হয়ে ওঠে। প্রথমদিকে ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মচারীদের আন্তরিকতা থাকলেও পরবর্তীকালে তা হ্রাস পায়। কারণ রোগীর সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি সত্ত্বেও নার্স, ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পেলে রোগীদের দুর্ভোগ ও অভিযোগ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। এছাড়া দায়িত্বরত ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্যদের কাজের যথাযথ তত্ত্বাবধান প্রয়োজন ছিল। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ মে ১৯৫৯, পৃ. ৩)

ষাটের দশকেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পূর্ব উল্লেখিত সমস্যা বিদ্যমান ছিল। এ সময় এক্স-রে প্লেটের অভাবে রোগীর ভীষন অসুবিধায় পড়ে। হাসপাতালের বাইরে যেসব জায়গায় এক্স-রে করা হতো, সেসব জায়গায় রোগীদের কাছ থেকে চড়া দামে এক্স-রে করা হতো। একজন রোগীকে

এক্সরে করার জন্য ৬০ টাকা দিতে হতো। অথচ সাধারণ এক্স-রে প্লেট গ্রহণের জন্য পূর্বে মাত্র ২৫ টাকা ধার্য ছিল। (*দৈনিক আজাদ*, ২১ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১) এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রতিদিন অন্তত ২৫০টি এক্স-রে করা হতো। বিষয়টি পূর্ব থেকে জানা সত্ত্বেও ঢাকার সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থা ও উদাসীনতার জন্য এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষ জরুরি ব্যবস্থা অবলম্বন করে কোনো এক্স-রে প্লেট আনার ব্যবস্থা করে নাই। এই অবস্থায় শহরের বেসরকারি ক্লিনিকগুলি তাদের দাম বৃদ্ধি করে দেয়। (*দৈনিক আজাদ*, ২১ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১) অথচ সময়মতো ব্যবস্থা না নেওয়ায় সেন্ট্রাল মেডিকেল ষ্টোর এক্স-রে প্লেট সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে হাসপাতালের এক্স-রে বিভাগ বন্ধ থাকায় রোগীরা দুরবস্থায় পড়ে। ১৯৬৩-৬৪ সালে হাসপাতালের মোট বার্ষিক আয় ছিল ৪৫,০০,০০০ রুপি এবং বার্ষিক ৬,৯০,০০০ রুপি সরকার কর্তৃক অনুমোদন করা হয় এবং বার্ষিক আর্থিক ব্যয় ছিল ৪৫,০০,০০০ রুপি। (S.N.H, Rizvi, *East Pakistan District Gazetteer, Dacca*, 1969, p. 271.)

সরকারি কার্যবিবরণীতে দেখা যায় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য আলাদা করে কোনো এক্স-রে প্লেট কেনা হতো না। এক্স-রে প্লেট চাহিদা অনুসারে তেজগাঁও অবস্থিত কেন্দ্রীয় মেডিকেল স্টোর থেকে সরবরাহ করা হতো। এক্স-রে মেশিন ইটালি, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করা হতো। ১৯৬৫-৬৬ সালে এই হাসপাতালে ৫৯,৮৪৮ টি এক্স-রে করা হয়। আউট-ডোর রোগীর জন্য ১৬,৩৭৭টি এবং অভ্যন্তরীণ রোগীদের জন্য ১৫,১৬৫টি এক্স-রে প্লেট ব্যবহৃত হয়। এজন্য ২৮,৩০৬ রুপির প্লেট ব্যবহৃত হয় এবং যার আদায়যোগ্য ফি ছিল ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ১৫৫ রুপি। (*East Pakistan Provincial Assembly*, First Session 1967, 1969, p. 15) ১৯৬৭ সালে পূর্ব পাকিস্তানে মোট এক্স-রে মেশিনের সংখ্যা ছিল ২৯টি। (*East Pakistan Provincial Assembly*, First Session 1967, 1969, p. 15) একটি রাষ্ট্রীয় সরকারি হাসপাতাল হিসাবে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রিন্সিপাল কাম মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্টের অধীনে ছিল। ১৯৬৫ সালে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯০০টি। (S.N.H, Rizvi, *Dacca*, 1969, p. 271.) হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসকদের মধ্যে ২৭ জন অধ্যাপক, ইস্ট পাকিস্তান হেলথ সার্ভিসের (উঁচু) ৬২ জন চিকিৎসক, ৯০ জন অনারারি হাউজ স্টাফ, ২৭ জন বিশেষজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৮০ জন নার্স, ৯৬ জন নারী নার্স এবং ৫৯ জন পুরুষ নার্স। (S.N.H, Rizvi, *Dacca*, 1969, p. 271.)

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, নার্সি ট্রেনিং স্কুল সংযুক্ত ছিল। হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগসুবিধার ও ব্যবস্থা ছিল। যেমন, রেডিও থেরাপি, প্যাথলজি, ফিজিওলজি ট্রেনিং। এ সময় রেডিও আইসোটপ সেন্টার, ডক্টরস কোয়ার্টার, নার্সেস কোয়ার্টার নির্মাণ, অপারেশনোত্তর ওয়ার্ডে বাতি ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এবং এক্স-রে বিভাগের কাজ সম্পন্ন করে। ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠিত রক্ত সঞ্চাল বিভাগটি ষাটের দশকে সম্প্রসারণ করা হয়। (S.N.H, Rizvi, *Dacca*, 1969, p. 271.) রক্ত সংগ্রহের জন্য রক্ত দাতাদের প্রত্যেককে দশ আউন্স পরিমাণ রক্তের জন্য ৪০ টাকা দেওয়া হতো। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯৫৯ অক্টোবর ৯, পৃ. ৬) এ সময় হাসপাতালে বিভিন্ন ইউনিট ও বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালে অর্থোপেডিক বিভাগ, একই বছর ক্যাজুয়ালটি বণ্টক, ১৯৬৫ সালে ইউরোলজি ইউনিট, ১৯৬৯ সালে ফিজিক্যাল মেডিসিন এবং রিহ্যাবিলিটেশন বিভাগ, ১৯৭০ সালে নিউরোসার্জারি ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়। (অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম আর মাহবুব, ২০১৩, পৃ. ১২৮-১২৯)

পঞ্চাশের দশকের মতো ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ছয়টি মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নি ও অবৈতনিক শিক্ষানবীশ চিকিৎসকগণ কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য দুইদিন ব্যাপী ধর্মঘট পালন করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সকল বিভাগ, বিশেষ করে ইমার্জেন্সি এবং গাইনি ওয়ার্ডে রোগীদের

দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রসুতি এবং ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের অভাবে অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করে। বিশেষ করে প্রসুতি ওয়ার্ডটি কেবল চিকিৎসকদের দ্বারাই পরিচালিত হতো। ক্লিনিক্যাল এসিস্ট্যান্ট না থাকায় একজন চিকিৎসককে ইমার্জেন্সি ও প্রসূতি দুইটি ওয়ার্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হতো। একজন চিকিৎসকের পক্ষে কোনো একটি ওয়ার্ডের কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। একজন প্রসূতি রোগীর অবস্থা সম্পর্কে *দৈনিক আজাদ* পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ২২ তারিখ রাতে প্রসব ব্যাথা নিয়ে যখন একজন মহিলা গাইনি ওয়ার্ডে উপস্থিত হন, সে সময়ে ঐ ওয়ার্ডে কোনো চিকিৎসক না থাকায় তাকে বিপদজনক অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হয়। পরে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ড থেকে চিকিৎসক এসে রোগীকে পর্যবেক্ষণ ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। অনুরূপভাবে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে ও গুরুতর অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসায় তীব্র সংকট সৃষ্টি হয়। (*দৈনিক আজাদ*, ২৩ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১) তবে ধর্মঘটের ব্যাপারে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের যুক্তি ছিল, তারা তাদের দাবিদাওয়া কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করলেও কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, বরং কর্তৃপক্ষের এই ব্যাপারে অনমনীয় মনোভাব ছিল। ফলে তাঁরা বাধ্য হয়ে ধর্মঘটের পথ বেছে নেয়। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কাছে বিষয়টি উপেক্ষিত ছিল এবং এই প্রদেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় এক ধরনের বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। যে কারণে অভাব অভিযোগের পরিমাণ ছিল এত দীর্ঘ। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রোগী ছিল অসংখ্য, কিন্তু চিকিৎসক ছিল অল্পসংখ্যক। ফলে হাসপাতাল থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, শয্যা, যন্ত্রপাতি ও ঔষধের অভাব ছিল। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ নভেম্বর ১৯৬৩, শুক্রবার, পৃ. ৪) হাসপাতালে যথেষ্ট শয্যা না থাকায় কোনো কোনো রোগীকে চিকিৎসা না নিয়ে চলে যেতে হয়েছে। সে সময়ের একটা আলোকচিত্রে তা ফুটে ওঠে এবং ছবির নিচে লেখা ছিল,

> হাসপাতালে কোনো বেড খালি নেই বলে নিরাশায় ভগ্ন মনে সে অজানা ভবিষ্যতের পথে মৃত্যুর কাল সমুদ্রে। জনসাধারণের জন্য সরকার দয়া করে এতটুকু করুনা করে কিছু বেড বাড়ালেই এই দুর্ভাগ্যের জায়গা হতে পারে হাসপাতালে রোগ-মুক্তির সংগ্রামের আদি বর্তমান ও ভাবীকালের মনুষ্য সম্পদে। (আহমদ রফিক, ২০০৩, পৃ. ২৬০)

কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অবহেলা এবং সংশ্লিষ্ট সরকারি মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতার কারণে ছাত্র ও চিকিৎসকদের বিভিন্ন দাবি পূরনের চেষ্টা করা হয়নি। অথচ প্রতিবছর নতুন নতুন ছাত্র ভর্তির কারণে ছাত্র সংখ্যা ও ইন্টারনি চিকিৎসকের সংখ্যা বেড়েছে কিন্তু হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা, উচ্চতর চিকিৎসাশিক্ষা ব্যবস্থা বা কলেজ ছাত্রদের শিক্ষা বিষয়ক সুযোগসুবিধা বাড়েনি। এ সময় চিকিৎসকের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকের এবং রোগীর সঙ্গে চিকিৎসকের মানবিক ও সহযোগীতামূলক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নাই।

রোগ ও স্বাস্থ্যহীনতার লীলাভূমি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম অঞ্চল। গ্রামগুলোতে অতি প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাব ছিল। এ সময় কলেরা ও বসন্তের প্রকোপ ছিল। সাধারণত শীতের শেষে বসন্ত রোগ দেখা দিত। রোগ যখন ভীষনভাবে দেখা দেয় তখনই টিকা দেওয়ার তৎপরতা শুরু হয়। পূর্ব থেকে টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। অর্থাৎ রোগীদের যথাসময়ে টিকা দেওয়া হতো না। পূর্ব পাকিস্তানের জনস্বাস্থ্য বিভাগ এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে পারেনি। (*দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নানা অব্যবস্থা ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ধর্মঘট ও সংক্রামক রোগ মহামারিরূপ নেওয়ার মূল কারণ এক সূত্রে বাধা। উপরন্তু ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে ' Clause-4 -এ Medical Practitioner' দের ওপর ট্যাক্স ধরা হয়। যেসব ডাক্তারদের প্রাকটিসের বয়স পাঁচ বছর তাদের ওপর ৫০ টাকা ট্যাক্স ধরা হয়। (*East Pakistan Provincial Assembly, Budget Session 1966-67,* The 25th-29th June 1966 & The 22-24th June, Dacca, 1967, p. 295, p. 69) ফলে অনেকেই আপত্তি জানান এবং

প্রাদেশিক আইনসভায় উত্থাপন করেন। এ সময় এমন অনেক ডাক্তার ছিল যারা হাউজ সার্জন হিসাবে অনারারি সার্ভিস দিত এবং এমন অনেক ডাক্তার ছিল যারা ১০ বছরের মধ্যে ভালোভাবে সংসার চালাতে পারেনি, তাদের জীবনযাপন কষ্টকর ছিল। তাই আইনসভার সদস্য মোসলেম উদ্দিন সরকারকে ইনকাম ট্যাক্স-এর তালিকা তৈরি এবং যারা ইনকাম ট্যাক্স দেওয়ার উপযুক্ত তাদের ওপর ট্যাক্স ধরার আহবান জানান। (*East Pakistan Provincial Assembly, Budget Session 1966-67,* The 25th ----29th June 1966 & The 22-------24th June, Dacca, 1967, p. 295, p. 69) এর ফলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসকসহ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের চিকিৎসকগণ অসন্তোষ হন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ তাদের বিভিন্ন দাবির প্রতি সমর্থন এবং দাবি পূরণের জন্য আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের চিকিৎসা ব্যবস্থায় ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের কার্যকলাপে ত্রুটি ও ব্যর্থতা ফুটে ওঠে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বিরাজমান পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য, পূর্বাঞ্চলে উন্নততর শিক্ষার দুরবস্থা, আধুনিক ব্যবস্থাদির অভাব, হাসপাতালের স্বল্পতা, চিকিৎসাসেবার অব্যবস্থা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ও চিকিৎসকগণ আন্দোলন করতে বাধ্য হন। এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসকদের দাবিদাওয়া পূরণ হয়। চিকিৎসকদের চাকুরি প্রথম শ্রেণির মর্যাদা, ইন্টারনিশিপ বাধ্যতামূলক এবং কলেজ ও হাসপাতালের নানা উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদন করা হয়। এর ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হাসপাতালে আরো নতুন নতুন বিভাগ ও ইউনিট যেমন, কার্ডিওলজি ইউনিট (১৯৮০), প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট (১৯৮১), ইপিআই সেন্টার (১৯৮৩), এন্টিনাটাল ক্লিনিক (১৯৮৮), এমআরটিএসসি (১৯৮৮), নেফ্রোলজি ইউনিট (১৯৮৮), বার্ন ইউনিট (১৯৮৯), মাইক্রোবায়োলজি (১৯৮৯), বায়োকেমিস্ট্রি (১৯৮৯) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পরিশেষে বলা যায় ১৯৪৬ সালে পূর্ববাংলার জনগণের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে স্থাপিত হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। কালের পরিক্রমায় এই হাসপাতালটি আজ পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের একটি অন্যতম সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশের চিকিৎসা সেবায় এই প্রতিষ্ঠানটি বহু বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠান এই দেশের সাধারণ জনগণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে আসছে। চিকিৎসা মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক ও নির্ভরযোগ্য করে তুলতে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত চিকিৎসকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ক্লিনিক্যাল বিভাগগুলো হাসপাতালের অপরিহার্য অংশ। এই দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরো উন্নতির স্বর্নশিখরে নিয়ে যাওয়ার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক অন্যতম ভূমিকা রেখে চলেছেন। অথচ পাকিস্তান শাসন আমলে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে এর উন্নয়ন ও চিকিৎসা সেবা কখনও কখনও ক্ষুণ্ন হয়। এর ফলে রোগীরা ভোগান্তির শিকার হন। প্রশাসনিক ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে হাসপাতালের নিযুক্ত চিকিৎসক, শিক্ষক, ছাত্র এবং প্রশিক্ষণরত চিকিৎসককে সুযোগসুবিধা কম দিলেও এর চিকিৎসা ব্যবস্থা বিশ্বমানসম্মত ছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশকৃত চিকিৎসকগণ দেশ ও বিদেশে তাদের ভূমিকা পালন করে ব্যাপক সম্মান বয়ে এনেছেন এবং আনছেন। বিদেশেও এই মেডিকেল কলেজ সুপরিচিত। তাদের চিকিৎসাসেবার দ্বারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করা চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবার মান উপস্থাপন করা হয়। চিকিৎসা সেবার মান উন্নত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে সুযোগসুবিধা কম দেওয়া হলে তারা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ ও তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন এবং দাবি মানতে বাধ্য করেন। ফলে হাসপাতালের চিকিৎসকদের সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পায় এবং এর অবকাঠামোগত, চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট নানা উন্নয়ন ঘটে। তবে এই উন্নয়ন এখনও অব্যাহত আছে। এটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে বিশ্বমানসম্মত হতে সহায়ক হবে।

উল্লেখপঞ্জি

Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1946-52, East Bengal Government Press 1954, p, XVI, p. XIX, p. XVIII., pp. 26-27, p. 130. (BFPO)

Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal for the year 1948, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, p. 1, p. 2. (BFPO)

Annual Report on the Working of Hospital and Dispensaries in the Province of East Bengal for the year 1949, East Bengal Government Press, Dacca, 1956, p. 1, p. 2. (BFPO)

Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1949-50, p. 63. (BFPO)

Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1951-52, pp. 182-184. (BFPO)

Annual Report for 1959-60, *University of Dacca*, p. 105 (DUL)

Assembly Proceedings (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly*, Fourth Session, 1949-50, 3rd, 6th, 7th, 8th, 9th,10th,11th and 13 March 1950, East Bengal Government Press, Dacca, 1952, P. 52. (DUL, REAR SECTION)

Assembly Proceedings (Offical Report), *East Bengal Legislative Assembly*, (Ninth Session), 22-31 October and 1st November, 1952, East Bengal Government Press, Dacca, 1954, P. 27. p. 314. (DUL)

Assembly Proceedings, East Pakistan Provincial Assembly, Budget Session 1966-67, The 25th -29th June 1966, East Pakistan Government Press, Dacca, 1967, p. 295

Assembly Proceeding, East Pakistan Provincial Assembly, Budget Session 1966-67, The 22-24th June, East Pakistan Government Press, 1967, p. 69. (DUL)

B. Proceedings, B. No. 104, List No. 109, Sl No. 78, *Public Health and Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal, 1949*, p. 1. (NAB)

B. Proceedings, B. No. 104, *Public Health and Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal*, 1950, pp. 1-2. (NAB)

B. Proceedings, B. No. 107, List No. 109, Sl No. 81, *Public Health and Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal,* 1949. (NAB)

B. Proceedings, B. No. 125, *Public Health* and *Local Self-Government Department, Medical Branch*, *Government of East Bengal,* 1953. p. 1,5,6,7. (NAB)

B. Proceedings, B. No. 126, Public Health and *Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953. (NAB)

B. Proceedings, B. No. 128, List No. 109, Sl No. 102*, Public Health and Local Self-Government Department, Medical Branch, Government of East Bengal,* 1953, p. 3, pp. 3-4, p. 5. (NAB)

Dr. A.K. M Abdul Wahed (ed.) (1948), Principal-Cum-Superintentdent (ed), *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 15 August 1947 to 31st March 1948*, p. 5, pp. 19-25, p.7, p.26.

Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed.), *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1948-49*, p. 31 (BFPO)

Dr. A.K.M Abdul Wahed (ed), *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1949-50*, East Bengal Government Press, Dacca, 1953-54, p, 61, p. 89, p.86, p.86-87, p.90, pp. 92-94. (BFPO)

Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed.), *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1950-51*, p. 120, p. 118. (BFPO)

Dr. A.K.M. Abdul Wahed (ed), *Annual Report of the Dacca Medical College and Hospital for the year 1951-52*, p. 137. p. 166, p. 167, p.168. p. 176. p. 181. pp. 182-184. (BFPO)

Executive Council 1951-52, University of Dacca, 27 October 1951, p. 3. (EC OFFICE, DU)

East Pakistan Provincial Assembly, First Session 1967, The 26th ------31st January 1967, East Pakistan Government Press, Dacca, 1969, p. 15, pp. 14-19 (DUL)

Health Schemes of East Bengal, East Bengal Government Press, Dacca, November 1953, pp. 5-7. (NAB)

O)*List of Hospitals and Dispensaries in East Pakistan* (Corrected up to 31st December 1961) Directorate of Health Services, Government of East Pakistan, East Pakistan Government Press, Dacca, 1963, pp. 1-4. (BFP

S.N.H, Rizvi (1969), *East Pakistan District Gazetteer, Dacca*, East Pakistan Government Press, Dacca, 1969, p. 271. (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ এপ্রিল ১৯৫৬, পৃ. ৫ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ নভেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ৫ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬, পৃ. ১ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ১ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, সোমবার, ১১ নভেম্বর ১৯৫৭, পৃ. শেষ। (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ জানু ১৯৫৯, পৃ. ১ শেষ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক ১ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ১ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ৬ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ২ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ মার্চ ১৯৫৯, পৃ. ৬ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৬ এপ্রিল ১৯৫৯, পৃ. ১ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ১৫ মে ১৯৫৯, পৃ. ৩ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ৯, অক্টোবর, ১৯৫৯ পৃ. ৬। (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ নভেম্বর ১৯৬৩, শুক্রবার, পৃ. ৪ (DUL)

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৩ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১ (DUL)

দৈনিক নাজাত, ১২ মে, ১৯৫৯, পৃ. ১ (DUL)

দৈনিক আজাদ, ১৯৬৩

দৈনিক আজাদ, ২১ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১। (DUL)

দৈনিক আজাদ, ২৩ নভেম্বর ১৯৬৩, পৃ. ১ (DUL)

অধ্যাপক ডা. মনিলাল আইচ লিটু, এম আর মাহবুব (২০১৩)। *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*, ঢাকা: গৌরব প্রকাশন, পৃ. ১২৮-১২৯।

আহমদ রফিক (২০০৩)। *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, পৃ. ২৬০। (DUL)

বিগ্রেডিয়ার জহির উদ্দিন আহমেদ 'ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-৯৩' *৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও পুনর্মিলনী-৯৩*, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ১৯৯৩। [DMCL]